চৈত্র দিন

ননী ভৌমিক

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি (প্রাইভেট) লিমিটেড
কলিকাতা-১২

অক্টোবর, ১৯৫৮

প্রকাশ করেছেন :
সুরেন দত্ত
ন্যাশনাল বুক এজেন্সি (প্রাঃ) লিমিটেড
১২ বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রচ্ছদশিল্পী : পূর্ণেন্দু পত্রী

ছাপিয়েছেন :
সুনীল কুমগ্রামী
গণশক্তি প্রিন্টার্স (প্রাঃ) লিমিটেড
৩৩ আলিমুদ্দীন স্ট্রীট
কলিকাতা-১৬

দাম : চার টাকা

বক্তব্য

গল্পগুলি একেবারে হালের লেখা নয়। ঈষৎ-অতীত এক একটা ঘটনার পটভূমি এদের পেছনে আছে। পটভূমির এই আঁকাড়া ছাপটা অনেকের মতে রাজনৈতিক। জীবনের ক্ষেত্রে সেটা অবশ্যই অগ্রাহ্য হতে দেখিনি, কিন্তু গল্পের ক্ষেত্রে তা এতই অমার্জনীয় বলে ধরা হয় যে কৈফিয়ৎ দেওয়া ভালো। হ্যাঁ, রাজনৈতিক। গল্পের পরিণামে পর্যন্ত যদি মনোবিকলনী থিয়োরি, কিংবা আধ্যাত্মিক ছক অথবা যৌনতত্ত্বীয় স্টান্ট থাকতে পারে, তাহলে তার অবয়বে কিছু রাজনীতি থাকলেই বা দোষের কেন? ছোটো গল্প নিশ্চয় অতোটা ছোটো নয়। তাছাড়া কপাল দোষে এ যাবৎ কিছু বেয়াড়া পথেই আমাকে হাঁটতে হয়েছে। দুঃখ এবং সমস্যার চেহারাটা একটু ভিন্নতর হলেও সেখানকার মানুষেরাও মানুষ—হয়ত অনেক ক্ষেত্রেই অনেকের চেয়েই বেশি মানুষ। এমনি কিছু মানুষের কিছু মুহূর্ত, মুখচ্ছবি ও মনুষ্যত্বের কথা সকলে যদি বা না লেখেন, কেউ কেউ লিখুন। লিখতে গিয়ে দেখেছি, সে কাজ কতো কঠিন। তাই আমার গল্পের পাত্র-পাত্রীদের কোনো একজনকেও যদি আংশিক সত্যমূল্য দিতে পেরে থাকি তবে হাজার সমালোচনা মাথা পেতে নেবার জোর পাবো।

ভয়ে ভয়ে বলি, গল্পগুলিতে অন্বেষণ আছে। কিন্তু যে কোনো অন্বেষণের সঙ্গে থাকে বিশ্বাস। অবিশ্বাসী অন্বেষণে আমার সায় নেই। সিঁদুরে মেঘ দেখলেই যাঁরা ঘর পোড়ার আতঙ্কে সোরগোল তোলেন তাঁদের কাছে ক্ষমা চেয়ে রাখি।

পুরনো গল্প, পরিমার্জনার দরকার ছিল। বিদেশে চলে আসার ফলে কিছুই সাজিয়ে গুছিয়ে এবং দেখে দিতে পারিনি। তথাপি বন্ধুরা যতোটা যত্ন নিয়ে বইখানি প্রকাশে সাহায্য করেছেন, তার জন্য কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

—লেখক,

মস্কো, ২০শে আগস্ট॥

পালাশ সন্ধ্যা

এক এক করে এসে গেল যা আসবার। লটবহর, দড়িদড়া, খোঁটাখুঁটি, শিক-পাটাতন। বড়ো বড়ো প্যাকিং বাক্স, যা আসবার এল পেট-ভর্তি মাল নিয়ে, তারপর হঠাৎ কি করে টিকিটঘর, ডায়াস, আর বাজানাদারদের মঞ্চ হয়ে গেল দেখে অবাক লাগারই কথা। তালে তালে বাড়ি মেরে শিকগুলো যখন পোঁতা হচ্ছিল তখনো কিছু বোঝা যায়নি। তারপর হৈ হৈ করে মাঝখানের মোটা কাঠের পিলারটা যখন খাড়া করা হল, আর সঙ্গে সঙ্গে খাড়া হয়ে উঠল একটা মস্ত তাঁবুর চাঁদোয়া তখন অবাক হয়ে গেল সবাই।

তাঁবুটা নতুন নয়। পুরনো ছেঁড়া, ফাটা। কিন্তু সে শুধু মাথার ওপরটায়। জায়গায় জায়গায় বড়ো বড়ো চৌকো কালি খসে গেছে কেমন করে। খেলা আরম্ভ হবার আগের দিন তাঁবুর চারপাশ যা দিয়ে ঢাকা হল, সেটা পুরনো হতে পারে কিন্তু নিশ্ছিদ্র। বিনা টিকিটে, ভেতরে না ঢুকে, বাইরে থেকে উঁকিঝুঁকি দিয়ে কেউ দেখবে সে সুযোগ একটুও রাখা হল না।

আর তাঁবু আর বেঞ্চি আর গ্যালারি যখন আশ্চর্য দ্রুততায় সেজে উঠছে তখন এল দ্বিতীয় দফার ক্যারাভান—একটা ধূলিধূসর, চামড়াঝোলা, চোখে পিঁচুটি-পরা বেঁটে হাতী। একটা বিবর্ণ বাঘের খাঁচা। একটা রামছাগল। দুটো বাঁদর, ঘোড়া। নাকে দড়ি বাঁধা একটা ভালুক। যতক্ষণ তারা এল, ততক্ষণ দেখা গেল তাদের।

তার পরেই তাঁবুর পেছন দিককার 'এক ঘেরা জায়গায় তারা আশ্রয় নিলে। উঁকি দিয়ে দেখতে গেলেই তাড়া খেতে হচ্ছিল। এবং সবশেষে এল খেলোয়াড়ের দল। কুলি-মিস্ত্রিদের সঙ্গে মিশে তারাও এমন পোশাকে এমনভাবে খাটাখাটনি করলে যে প্রথম দিন-তুইয়ের মধ্যে বোঝাই গেল না, এদের মধ্যে কারা খেলোয়াড়, কারা রাত্রে ঝকঝকে ফট ফটে সাজ-পোশাক আদব-কায়দায় মুগ্ধ করে দেবে দর্শকদের।

কিন্তু প্রথম দিন থেকেই আশেপাশের গঞ্জ-শহরের সকলেই যাকে চিনে ফেলল, সে ব্যানার্জী,—দি গ্রেট ন্যাশনাল সার্কাসের সেই হল ম্যানেজার। প্রথম দিন এসেই সে আলাপ জমিয়ে নিলে আশেপাশের গুরুত্বপূর্ণ সব ক'টি লোকের সঙ্গে, ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট, মেলা কমিটির সেক্রেটারি, সার্কেল হাকিম, তু'মাইল দূরের কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট ব্লকের সস্ত্রীক অফিসার থেকে শুরু করে বাজারের একমাত্র মিষ্টির দোকানের মালিক এবং আশেপাশের ভাঙা জমিদার বাড়ির বেকার বখাটে জনকয়েক যুবকের সঙ্গে। পকেট থেকে এমন সব সস্তা সিগারেট বার করে অফার করলে যা এসব এলাকায় এখনো কেউ দেখেনি, নিজে যেচেই খসখস করে কয়েকটা পাশ লিখে দিলে। তারপর হাসতে হাসতে জানালে, কি জানেন, ইয়ং ম্যানদের আমি কিছু কিছু পাশ এমনিতেই দিই। এটা আমার একটা ফ্যান্সি। দেখুন আপনারা, দেখবার মতো জিনিস যদি হয় তো দেখুন।······তবে হ্যাঁ, এক একটা জায়গায় গেছি কতো রকম লোক আছে বুঝলেন না। কেউ বলে তাঁবুতে আগুন লাগিয়ে দেবে, বয়কট করবে। আবার আমি যদি বলি, কুছপরোয়া নেহি, দেখি কে কি করতে পারো, চলে এসো,—তাহলে কি সাধ্যি আছে ওদের। কিন্তু ঝামেলা আমি 'করতে চাই না। তাই বলছিলাম, এ জায়গাটা অবিশ্যি তেমন নয়; সে সব আমি আগেই খোঁজ নিয়েছি তবু আপনারা এখানকার স্থানীয় লোক। দেখবেন, যেন অকারণে কোনো হাঙ্গামা হুজ্জত কেউ না বাধায়। পাশ চান? কাম অন্, কটা চাই? আপনারা ইয়ং ম্যান! আপনাদের তো দেবই।······

তারপর কথা শেষ করে চলে যাবার সময় পকেট থেকে আবার সেই শস্তা আর অদ্ভুত অজানা সব সিগারেট বার করলে ব্যানার্জী। বললে; দেখুন আমিও ভদ্রলোকের ছেলে। লেখাপড়াও কিছু করেছি। তবু কি জানেন, এই দিকেই কেমন একটা ঝোঁক এসে গেছে। সেই যে শেকস্‌পীয়র বলেছিলো না, দি ওয়ার্লড ইজ এ স্টেজ! তা আমি বলি, দি ওয়ার্লড ইজ এ সার্কাস। ঠিক কি না বলুন?

আশেপাশের গাঁয়ের ভাঙা জমিদার বাড়ির উঠতি বেকারের দল সবটা না বুঝেও সোৎসাহে সায় দিয়ে হাসল 'হ্যাঁ হ্যাঁ' করে; 'এ্যাই! এ্যাই একটো খাঁটি কথা আপনি শোনাইলেন আমাদিকে।'

তারপর ছোঁক ছোঁক করে ঘুরতে লাগল জানোয়ার রাখার জায়গাটার বাঁ দিকে। অতো ঢাকঢুক নেই, তবু কাঁটাতারে জায়গাটা ঘেরা। ছোটো ছোটো তাঁবু। তাঁবুর দড়িতে, কাঁটাতারের গায়ে টুকিটাকি রঙীন ব্লাউজ, কাঁচুলি, শালোয়ায় শুকোতে দেওয়া। মেয়েরা থাকে এদিকটায়, বাঙালী মেয়ে।

দি গ্রেট ন্যাশনাল সার্কাসের প্রধান আকর্ষণই হল এই মেয়েদের খেলা।

জোয়ান বেকারের দল খানিক উঁকিঝুঁকি দিয়ে তারপর ধমক দেয় অন্যদের। 'এ্যাই ইদিকে কি? ইদিকে কি বটে? লাজসরম নাই তুদের?'

না লাজ সরম নাই। কালোঝুলো গেঁয়ো একদল চাষী মান্দের গাড়োয়ান। গাঁয়ের ডাঙা ভদ্রলোকের পাড়া ছাড়িয়ে দূরে যারা থাকে, সারা সার্কাসটার চারপাশে উৎসুক হয়ে উঁকি দিয়ে বেড়িয়েছে ওরা—ছোঁড়া, জোয়ান, মাঝবয়সী, বুড়ো—নানান বয়সের একপাল অত্যন্ত কৌতূহলী। তারপর হাঁ করে এসে তাকিয়ে তাকিয়ে আছে মেয়েদের দিকেঃ সার্কাসের মেয়ে! এই বাবা!

এই তাকিয়ে থাকাটা কিন্তু বেলার তেমন খারাপ লাগেনি প্রথমে। চোকো, মোটা, কালোঝুলো নানান বয়সী গ্রাম্য মুখগুলোর মধ্যে একটা গেঁয়ো নির্বুদ্ধিতা, একটা সরল কৌতূহল ছাড়া আর কিছু সে দেখেনি। বেলা জানে, এরা এক অন্য জাতের, অন্য জগতের। যারা অন্য জাতের

তার পরেই তাঁবুর পেছন দিককার এক ঘেরা জায়গায় তারা আশ্রয় নিলে। উঁকি দিয়ে দেখতে গেলেই তাড়া খেতে হচ্ছিল। এবং সবশেষে এল খেলোয়াড়ের দল। কুলি-মিস্ত্রিদের সঙ্গে মিশে তারাও এমন পোশাকে এমনভাবে খাটাখাটনি করলে যে প্রথম দিন-দুইয়ের মধ্যে বোঝাই গেল না, এদের মধ্যে কারা খেলোয়াড়, কারা রাত্রে ঝকঝকে ফট ফটে সাজ-পোশাক আদব-কায়দায় মুগ্ধ করে দেবে দর্শকদের।

কিন্তু প্রথম দিন থেকেই আশেপাশের গঞ্জ-শহরের সকলেই যাকে চিনে ফেলল, সে ব্যানার্জী,—দি গ্রেট ন্যাশনাল সার্কাসের সেই হল ম্যানেজার। প্রথম দিন এসেই সে আলাপ জমিয়ে নিলে আশেপাশের গুরুত্বপূর্ণ সব ক'টি লোকের সঙ্গে, ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট, মেলা কমিটির সেক্রেটারি, সার্কেল হাকিম, দু'মাইল দূরের কমিউনিটি ডেভেলপমেণ্ট ব্লকের সস্ত্রীক অফিসার থেকে শুরু করে বাজারের একমাত্র মিষ্টির দোকানের মালিক এবং আশেপাশের ভাঙা জমিদার বাড়ির বেকার বখাটে জনকয়েক যুবকের সঙ্গে। পকেট থেকে এমন সব সস্তা সিগারেট বার করে অফার করলে যা এসব এলাকায় এখনো কেউ দেখেনি, নিজে যেচেই খসখস করে কয়েকটা পাশ লিখে দিলে। তারপর হাসতে হাসতে জানালে, কি জানেন, ইয়ং ম্যানদের আমি কিছু কিছু পাশ এমনিতেই দিই। এটা আমার একটা ফ্যান্সি। দেখুন আপনারা, দেখবার মতো জিনিস যদি হয় তো দেখুন।……তবে হ্যাঁ, এক একটা জায়গায় গেছি কতো রকম লোক আছে বুঝলেন না। কেউ বলে তাঁবুতে আগুন লাগিয়ে দেবে, বয়কট করবে। আবার আমি যদি বলি, কুছপরোয়া নেহি, দেখি কে কি করতে পারো, চলে এসো,— তাহলে কি সাধ্যি আছে ওদের। কিন্তু ঝামেলা আমি করতে চাই না। তাই বলছিলাম, এ জায়গাটা অবিশ্যি তেমন নয়; সে সব আমি আগেই খোঁজ নিয়েছি তবু আপনারা এখানকার স্থানীয় লোক। দেখবেন, যেন অকারণে কোনো হাঙ্গামা হুজ্জত কেউ না বাধায়। পাশ চান? কাম অন্, কটা চাই? আপনারা ইয়ং ম্যান। আপনাদের তো দেবই।……

তারপর কথা শেষ করে চলে যাবার সময় পকেট থেকে আবার সেই শস্তা আর অদ্ভুত অজানা সব সিগারেট বার করলে ব্যানার্জী। বললে, *দেখুন আমিও ভদ্রলোকের ছেলে। লেখাপড়াও কিছু করেছি। তবু কি জানেন, এই দিকেই কেমন একটা ঝোঁক এসে গেছে। সেই যে শেকস্‌পীয়র বলেছিলো না, দি ওয়ার্লড ইজ এ স্টেজ!* তা আমি বলি, *দি ওয়ার্লড ইজ এ সার্কাস। ঠিক কি না বলুন?*

আশেপাশের গাঁয়ের ভাঙা জমিদার বাড়ির উঠতি বেকারের দল সবটা না বুঝেও সোৎসাহে সায় দিয়ে হাসল 'হ্যাঁ হ্যাঁ' করে; 'এ্যাই! এ্যাই একটো খাঁটি কথা আপনি শোনাইলেন আমাদিকে।'

তারপর ছোঁক ছোঁক করে ঘুরতে লাগল জানোয়ার রাখার জায়গাটার বাঁ দিকে। অতো ঢাকঢুক নেই, তবু কাঁটা তারে জায়গাটা ঘেরা। ছোটো ছোটো তাঁবু। তাঁবুর দড়িতে, কাঁটাতারের গায়ে টুকিটাকি রঙ্গীন ব্লাউজ, কাঁচুলি, শালোয়ার শুকোতে দেওয়া। মেয়েরা থাকে এদিকটায়, বাঙালী মেয়ে।

দি গ্রেট ন্যাশনাল সার্কাসের প্রধান আকর্ষণই হল এই মেয়েদের খেলা।

জোয়ান বেকারের দল খানিক উঁকিঝুঁকি দিয়ে তারপর ধমক দেয় অন্যদের। 'এ্যাই ইদিকে কি? ইদিকে কি বটে? লাজসরম নাই তুদের?'

না লাজ সরম নাই। কালোঝুলো গেঁয়ো একদল চাষী মান্দের গাড়োয়ান। গাঁয়ের ডাঙা ভদ্রলোকের পাড়া ছাড়িয়ে দূরে যারা থাকে, সারা সার্কাসটার চারপাশে উৎসুক হয়ে উঁকি দিয়ে বেড়িয়েছে ওরা—ছোঁড়া, জোয়ান, মাঝবয়সী, বুড়ো—নানান বয়সের একপাল অত্যন্ত কৌতূহলী। তারপর হাঁ করে এসে তাকিয়ে তাকিয়ে আছে মেয়েদের দিকে: সার্কাসের মেয়ে! এই বাবা!

এই তাকিয়ে থাকাটা কিন্তু বেলার তেমন খারাপ লাগেনি প্রথমে। চোকো, মোটা, কালোঝুলো নানান বয়সী গ্রাম্য মুখগুলোর মধ্যে একটা গেঁয়ো নির্বুদ্ধিতা, একটা সরল কৌতূহল ছাড়া আর কিছু সে দেখেনি। বেলা জানে, এরা এক অন্য জাতের, অন্য জগতের। যারা অন্য জাতের

অন্ত জগতের তাদের দৃষ্টির সামনে লজ্জা হয় না। লজ্জা হয় স্বজাতের স্বজগতের দৃষ্টিপাতে।

বরং কেমন এক ধরনের খুশিই লাগে বেলার। খুকি-টুকির সামনে চুবাটি মুড়ি এগিয়ে দিয়ে তাঁবুর ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে বেলা। বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই চুল আঁচড়াতে থাকে সে, চুলের ডগাটুকু মুঠো করে চেপে ধরে ঘাড় কাত করে চিরুনি চালায়। তারপর আচমকা লঘু গলায় অবাক হয়ে বলে, 'বা ভারি সুন্দর ফুল তো। কি গাছ এটা জানো নাকি তোমরা ?'

কাঁটাতারের বেড়ার ওপাশে ছোটো বড়ো চৌকো চ্যাপ্‌টা একসার কৌতূহলী মুখ চঞ্চল হয়ে ওঠে একটু, কিন্তু জবাব আসে না কোনো। শুধু ফিস্‌ফিস্‌ একটু গুঞ্জন কানে আসে বেলার: হ দ্যাখ আমাদের পারাই কথা বলছে যে গো! বাঙালি ঘরেরই ব্যোটে বাবু!

আর এতক্ষণে, কেমন একটু অস্বস্তি লাগে বেলার। কি ভাবছে ওরা, দেখছে অমন হাঁ করে। কিন্তু সে শুধু অল্পক্ষণের জন্য। আবার খুশী হয়েই বেলা জিজ্ঞাসা করে 'এই যে শুনছ ? কি গাছ এটা ?'

ঋজু হাল্‌কা একটা গাছ। চৈত্রের ছোঁয়ায় পাতলা হয়ে এসেছে তার পাতা; গিঁটগিঁট হয়ে বেঁকেছে ডালপালা। যেন অনেক সহ্য করা, অনেক লড়াই চলা রূঢ় বাঁকা হাড়খোঁচা কোনো এক হতভাগার কাঠামো। গিঁটগিঁট। আর গিঁটে গিঁটে লাল হয়ে উঠেছে একরাশ রক্তিম কামনার মতো টকটকে ফুল।

চারদিকার এই ফাঁকা ফাঁকা গ্রামঞ্চলের এখানে সেখানে এই অদ্ভুত গাছগুলোকে দেখে সারা রাস্তা অবাক হয়েছে বেলা। পূর্ববঙ্গের মেয়ে সে। এরকম গাছ সে ছেলেবেলায় দেখেছে কিনা মনে নাই তার। তারপর কলকাতা, কলকাতার শহরতলী। এ রকম গাছ আর এরকম ফুল সে দেখেনি। ফুল দেখারই কি কোনো অবকাশ ছিল তার ? জীবনযাত্রার অজানা এক একটা পথে পা ফেলে সে তখন বাঁচার চেষ্টা করছে। ক্যাম্প, ডোল, তারপর হাতের কাজ সমবায়: সেলাই-ফোঁড়াই। তারপর ?

তারপর পাপ কি পুণ্য সে জানে না, প্রেম কি প্রতারণা সে জানে না। দু'তিন বছর মাত্র। দু'তিন বছর পর যমজ মেয়ে খুকি-টুকিকে কোলে নিয়ে আবার জীবিকার সন্ধান : সোডা কারখানায় বোতল সাজাবার কাজ, কেমিকেল কারখানায় লেবেল আঁটা। তারপর এক পাঞ্জাবীর রেষ্টুরেন্টে রেষ্টুরেন্ট-গার্ল, তারপর ব্যানার্জীর চোখে পড়ে এই সার্কাস। শেষের কাজগুলোয় দক্ষতার চেয়েও বড়ো একটা কোয়ালিফিকেশন তার ছিল : সে মেয়ে। পাঞ্জাবী চায়ের দোকানে ভিড় জমত, কি সার্ভ করা হল তার জন্যে নয়, কারা সার্ভ করছে। ব্যানার্জীর ন্যাশনাল সার্কাসও নাম করতে শুরু করেছে কি খেলা দেখানো হচ্ছে তার জন্যে নয়, কারা খেলা দেখাচ্ছে।

নাম করতে শুরু করলেও ন্যাশনাল সার্কাস, ন্যাশনাল সার্কাস নাম নিয়ে কলকাতার আশেপাশের মেলামণ্ডপ ছেড়ে মফঃস্বলে বেড়িয়েছে এই অল্পদিন। রাঢের এই এলাকায় এসেছে এই প্রথম। আর ঘিঞ্জির মধ্যে আটক পড়া, ঘিঞ্জির মধ্যে বেড়ে ওঠা বেলা হঠাৎ এত ফাঁকায়, এত লালচে ঢেউ খেলানো মাটি, কষ্টি পাথরের মতো কালো কালো তালগাছ আর খেঁজুর গাছের বাঁকা সারি দেখে খুশী হয়ে উঠল ছেলে মানুষের মতো।

'এ্যাই শুনছ কি গাছ ওটা ?'

কাঁটাতারের বেড়ার ওপাশে কালোঝুলো জোয়ানবুড়ো একসার মুখ শুধু নড়েচড়ে উঠল একটু। জবাব এল না এবারও।

আর অস্বস্তিটা আবার ঘন হয়ে আসে বেলার। মনে মনে সে বলে, 'মাগো ! এ আচ্ছা জায়গায় এসেছি তো !' তারপর জোর করে অস্বস্তিটা ঝেড়ে ফেলে তৃতীয়বার জিগ্যেস করে সে 'এ্যাই, এ্যাই লোকগুলো শুনছো···'

নির্বিকার উৎসুক মুখগুলোর মাঝ থেকে কেউ বোধ হয় সাহস করে বললে, 'পলাশ বটে !'

কে বললে হঠাৎ ঠাহর হল না বেলার।

পলাশ ! নামটা বেলার শোনা, কিন্তু দেখল এই প্রথম পলাশ ! চুলের জট ছাড়াতে ছাড়াতে বেলা সরে আসে কাঁটাতারের পাশে।

পায়চারি করে ও ছোটো তাঁবুটার সামনে। তারপর অন্যমনস্কের মতো আবার একসময় তাকায় গাছটার দিকে। টকটকে লাল ফুলগুলো যদি কেউ পেড়ে দিত। তাহলে খোঁপায় গুঁজত বেলা। না, নিজের খোঁপায় গুঁজত না। খুকি-টুকির ঝুনু ঝুনু চুল গোছটির গোড়ায় লাল রিবন না বেঁধে, বেঁধে দিত ওই ফুলগুলো। কি সুন্দর লাল।

অস্বস্তিটা তবু গেল না কিছুতেই।

বেলা ভেবেছিল, এ বোধ হয় প্রথম দিন বলে। কিন্তু দেখা গেল, প্রথম দিন, দ্বিতীয় দিন, তৃতীয় দিন—যতো দিনই যাক এই নির্বোধ-নির্বিকার কৌতূহলের বিরাম নেই। ঘুম থেকে উঠতে ঘাটে যেতে, খুকি-টুকিকে সাজিয়ে দিতে, রান্নার জোগাড় করতে, এর ওর সঙ্গে কথা বলতে, বেলা মাঝে মাঝে চমকে উঠত অস্বস্তিতে : ওরা দেখছে। কাঁটাতারের বেড়ার ওপাশ থেকে, ঘাটে যাবার পথের ঢিবিটার ওপর থেকে।

দিনের বেলা যখন টিকিট চাইবে না কেউ, যখন খেলোয়াড়েরা নিজেদের মধ্যে খেলা মকসো করে, তখন পুরনো তাঁবুটার একটা কোণ উঁচু করে তুলে উঁকি দিয়ে ওরা ঠিক তাকিয়ে আছে। ছোটো বড়ো কালোকুলো, নির্বিকার নির্বোধ একসার মুখ। তাকিয়ে আছে আর মাঝে মাঝে অস্পষ্ট গুঞ্জন করে কি আলাপ করছে নিজেদের মধ্যে।

অন্যের দৃষ্টি, বিশেষ করে পুরুষের দৃষ্টি বেলার কাছে নতুন নয়। চায়ের দোকানে রেস্টুরেন্ট্-গার্ল হবার পর থেকে পুরুষের দৃষ্টিপাত গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে বেলার। চায়ের দোকানে বাঙালি মেয়েরা সার্ভ করছে দেখেই অনেকে আসতে চাইত না। ফলে যারা আসত, তারা কেবল হাঁ করে চেয়ে দেখবার জন্যই আসত। সে চেয়ে থাকার মধ্যে তাদের না থাকত ভদ্রতা, না স্বাভাবিকতা। ছোটো, বড়ো, তরুণ, প্রৌঢ় ব্রোকার, ড্রাইভার, বাঙালী, পাঞ্জাবী—হরেক রকম লোকের হরেক রকম নির্লজ্জ দৃষ্টি সহ্য করতে কখন যেন অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল বেলা—নির্লজ্জ প্রস্তাব শুনতে, নির্লজ্জ ব্যবহার মানতে। তারপর ব্যানার্জীর চোখে পড়ে এই সার্কাস। ব্যানার্জী ওর শুকনো রোগাটে

চেহারাটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে বলেছিলো, খেলা না জানলেও চলবে। সে দু'একটা আমরা শিখিয়েও নিতে পারি। তোমার হবে। বয়স তো বেশি হয়নি। তাছাড়া গড়নটা তোমার মোটের ওপর হালকা। আমি বলছি হবে।···তবে ঐ খুকি-টুকিকেও খেলা দেখাতে হবে কিন্তু। বিশেষ করে ওদের জন্যেই তোমায় নিচ্ছি। এই বয়সে ওদের হাড়ের জয়েণ্টগুলো যদি একটু ফ্লেক্সিবিল করে নেওয়া যায়, তাহলে···

রেস্টুরেন্টের একঘর লোকের বদলে এখানে এক তাঁবু ভর্তি শুধু দৃষ্টি, শুধু হাঁ করে থাকবে চোখ। কিন্তু কোনো অস্বস্তি হয়নি বেলার। শাড়ি-ব্লাউজের শালীনতা ছেড়ে সে অনায়াসে গায়ে উঠিয়েছে আপাদ-কণ্ঠ আঁটো পোশাক। কালো মুখের উপর পাউডার লাগিয়েছে অজস্র, ঠোঁটে রঙ। আর তারপর, সব দিক দিয়ে ভূতপূর্ব ফিরিঙ্গি মেয়ে-খেলোয়াড়দের পোশাক নকল করলেও দুহাতে দুগাছা চুড়ি, গলায় খাটো একটু হার, আর মাথার পেছনে আঁট করে বাঁধা খোঁপার মায়াটুকু ছাড়তে পারেনি বেলা। আর পারেনি কপালে, সিঁথিতে জ্বলজ্বল করে সিঁদুর না দিয়ে। খুব বেশি খেলা সে তার রোগাটে হালকা শরীর সত্বেও এই বয়সে আর শিখে উঠতে পারেনি। খুব বেশি খেলা দেখাতেই হবে এটা ব্যানার্জী বা দর্শকেরা কেউই এখনো তেমন দাবি ওঠায়নি। বেলা এবং আর কয়েকটা মেয়ে অমনি আশ্চর্য পোশাকে ছুটতে ছুটতে এসে নমস্কার করবে, তারপর যে লোকটা মইয়ের খেলা দেখাচ্ছে তার মইয়ের ওপর উঠে যাবে তরতর করে, কিংবা তারের ওপর শুধু কোনোরকমে একটু হেঁটে আসবে, আর দূর থেকেও তাদের গলার হার চিকচিক করবে, জ্বলজ্বল করবে কপালের সিঁদুর—এইটুকু হলেই সকলে এখনো পর্যন্ত খুশি। ব্যানার্জী অবশ্য এর ওপরেও আরো একটা আকর্ষণ বার করেছে মাথা খাটিয়ে। দু'একটা খেলা হয়ে যাবার পর পরই ধুলো ধুলো পুরনো কনসার্টের সঙ্গে দু'একটা নাচ দেখিয়ে যেতে হবে বেলাদের। তাতে সুর, তাল, পদ-ক্ষেপের ততোটা দরকার পড়ত না, যতোটা দরকার পড়ত নতুন পোশাক নতুন কাঁচুলির।

পুরুষের দৃষ্টি কবে সহ্য হয়ে গিয়েছে বেলার। তবু, এতদিন পরে হঠাৎ তার অসহ্য লাগতে থাকে এই নির্বিকার নির্বোধ তাকিয়ে থাকা।

প্রথমদিকে তার মজা লেগেছে, তারপর উপেক্ষা করেছে, তারপর সমস্ত জিনিসটাই একেবারে অসহ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে এখন।

'কি ব্যাপার, কি! কি পেয়েছো তোমরা? সময় নেই, অসময় নেই, অনবরত কি অমন করে দেখছো তোমরা?'

'এ্যাই লোকগুলো! কি দেখছো কি?'

কাঁটাতারের ওপর ভেজা শায়া শুকুতে দিতে এসে বেলা শেষ পর্যন্ত চিৎকার করে ওঠে একদিন।

নির্বিকার মুখগুলোর মধ্যে চাঞ্চল্য জাগে একটু, কিন্তু কথা ফোটে না।

'একেবারে উত্যক্ত করে ছাড়লে রে বাবা! যাবে না? ম্যানেজারকে ডেকে আনবো! এ্যাই লোকগুলো, কি ত্যাখো কি অমন দাঁড়িযে দাঁড়িয়ে?'

কাঁটাতারের বেড়ার ওপাশে গুঞ্জন উঠল একটা। তারপর ছোটোবড়ো কালো ঝুলো মুখগুলোর মধ্য থেকে কে যেন সাহস করে বললে, 'তুমাকে দেখি গো! বাঙালী মেয়ে বটো তুমি, লয়?'

কে বললে বেলা ঠাহর পায় না। হয়ত সেই লোকটা যে প্রথম দিন ওকে পলাশ গাছটা চিনিয়েছিল। একটু থতমতো খায় বেলা। ওকে যারা দেখে, যারা দেখবে, তারা দেখে সামনে থেকে, দর্শকদের সিটে বসে। কিন্তু এ কেমন দেখা, পেছন থেকে, বেলাকে সাজবার অবকাশ না দিয়ে?

একটু থতোমতো খেলেও বেলা বিদ্রূপ করে রূঢ়ভাবে, 'আমাকে দেখছো? বাঃ! কিন্তু সে তো এখন নয়! সন্ধ্যের সময় এসো— টিকিট কেটে ওই সামনের গেট দিয়ে ঢুকবে। যাও ভাগো এখন!'

কালোঝুলো একসার নির্বোধ মুখ দুলে উঠল একটু! তারপর একটা মুখ সাহস করে আরো খানিকটা এগিয়ে এল কাঁটাতারের দিকে।

খোকার মতো সাদা সাদা দাঁত বার করে হাসলে। বললে, 'টিকিট লিছে যে ছ' আনা করে! টুকচি কমিয়ে দাও ক্যানে। তাইলে দেখি একদিন ভিতরে ঢুকে।'

এরপর কি বলতে হবে বেলার জানা ছিল না। সে শুধু রিক্তকণ্ঠে ধমক দিলে 'আরে! এই লোকটা একেবারে চলে আসছে দেখি! এদিকে মেয়েরা থাকে দেখতে পাচ্ছো না?'

লোকটা কয়েক পা এগিয়ে এসেছিল। খালি গা। চওড়া তেল মাখা ঘর্মাক্ত পিঠ। নিরীহ নির্বোধ মুখ। অসহ্য, অসহ্য রকমের গ্রাম্য। অসহ্য রকমের গ্রাম্য একটু হাসি হেসে কাঁধের গামছাটা খুললে। গামছা ভর্তি একরাশ টকটকে লাল ফুল। পলাশ!

'তুমার লেগে লিয়ে এলম পেড়ে। আমাদের এই স্থাখে কেনে বনবাদাড়ের ফুল বটে।···ও ছুটি তুমার মেয়া বটে, হাঁগো? উদিকে দিও ক্যানে খেলবে? বড়া মায়া লাগে বাপু উ ছুটিকে দেখে। আহ্‌, হা-হা-!'

ফুল দিয়ে লোকটা পিছিয়ে যায় আবার। পলাশ, কিন্তু বেলার জন্যে নয়, খুকি-টুকির জন্যে। খুকি-টুকিকে দেখে নাকি মায়া লেগেছে লোকটার।

হয়ত একটু নরম হয়ে এসেছিল বেলার মনটা। কিন্তু দ্বিগুণ তিক্ত হয়ে ওঠে তার পরের দিন।

সন্ধ্যায় খেলা দেখাবার আগে সকালে একটু আধটু একসারসাইজ, একটু আধটু মহড়া দিয়ে নিতে হয় প্রায় প্রত্যেক দিন।

বিশেষ করে যাদের কসরৎ এখনো তেমন পাকা হয়ে ওঠেনি, মকসো করাবার চাপ তাদের ওপরেই বেশি। সেই হিসেবে নৈমিত্তিক ট্রেনিং-এর ধকল চলছিল খুকি-টুকির ওপর দিয়ে। সন্ধ্যায় ওদের ওপর ভার ছিল একসঙ্গে ছুটতে ছুটতে এসে লাল রিবন বাঁধা মাথা নুইয়ে দর্শকদের বাউ করা, তারপর বিলিতী নাচের ভঙ্গিতে পাক খেয়ে ছোটো ছোটো আনাড়ি হাত ছুলিয়ে অভিবাদন জানানো। তারপর খেলা। নানারকম কঠিন কঠিন আর্ক করে, পিকক্ করে রুমাল তোলা। ব্যানার্জীর ইচ্ছে ওদের

আরো বেশি করে কাজে লাগানো। তাই, রোজ সকালে ট্রেনিং মাস্টারের কাছে ওদের ফেলে দেওয়া হয়। মাস্টার ওদের রোগাটে হাড় জিরজিরে শরীরের জয়েণ্টগুলো দুমড়িয়ে বেঁকিয়ে, চাপ দিয়ে আশ্চর্য কিছু একটা করার চেষ্টা করে। আর তা সইতে না পেরে মেয়ে-দুটো কষ্টে যন্ত্রণায় মাঝে মাঝে চিৎকার করে ওঠে আর্তস্বরে। মাঝে মাঝে ভয়ে কাঁপে থরথর করে। তারপর একবার ম্যানেজার, এক একবার মায়ের মুখের দিকে চেয়ে আবার প্রাকৃটিস শুরু করে চোখ মোছে।

সেদিন বারবার চড় খাচ্ছিল রোগাটে মেয়ে দুটো। শিরদাঁড়াটাকে যথেষ্ট নমনীয় করে তোলার জন্যে মোচড়া-মুচড়ির বিরাম ছিল না। থেকে থেকে তাই হাজার ধমক সত্ত্বেও আর্তকণ্ঠে কঁকিয়ে উঠছিল খুকি-টুকি। বেলা দাঁড়িয়েছিল নিঃশ্বাস বন্ধ করে।

হঠাৎ ফিস্ ফিস্ করে গুঞ্জন ভেসে এল একটা ঃ আহ্, হা, হা! বড়া মায়া লাগে গো মেয়ে দুটিকে দেখে!

আর নির্জন নিস্তব্ধ তাঁবুটার মাঝখানে চমকে ফিরে তাকাল বেলা। ব্যানার্জী, ট্রেনিং মাস্টার—সবাই একসঙ্গে। কে! কে ওখানে।

'উ মেয়া দুটি! বড়া মায়া লাগছে গো। ছেড়ে দাও বাবু উদিকে।' দিনের বেলাকার অসতর্ক নির্জন তাঁবুটার একটা প্রান্ত উঁচু করে তুলে উৎসুক হয়ে আছে সেই একসার ছোটোবড়ো কালোঝুলো নির্বিকার গ্রাম্য মুখ। তার মধ্যে একটু এগিয়ে এসেছে সেই চওড়া পিঠ, কাঁধে গামছা কালো মানুষটা যে বুঝি বেলাকে ফুল এনে দিয়েছিল পলাশ।

দেখে ক্ষেপে উঠল ব্যানার্জী, 'হুজ দেয়ার? কোন হ্যায় তোমলোগ' ভাগো। ভাগো হিঁয়াসে। দেখবার কিছু নেই এদিকে। যা দেখবার সন্ধ্যায়। এইসব গেঁয়ো লোকগুলো—। লালধারী সিং, ভাগাদেও উসকো......'

চোখের নীল গগ্‌ল্‌স্‌টা খুলে ব্যানার্জী কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে আসে আবার। ট্রেনিং মাস্টারের দিকে চেয়ে বলে, নাউ 'স্টার্ট এগেইন।'

আবার আর্তকণ্ঠে ককিয়ে ওঠে মেয়ে ছুটো।

আর অকারণে ব্যানার্জীর গা ঘেঁসে একটু সরে আসে বেলা। অন্যদিকে চেয়ে তিক্ত অথচ কেমন অন্যমনস্ক স্বরে বলে, 'ওই লোকটা রোজ উঁকি-ঝুঁকি মারে আমার তাঁবুর পাশে...'

'তাই নাকি ? একদিন ডাকো না ভেতরে। এসব গাঁয়ের লোক – দেখতে ওই রকম। কিন্তু ধান বিক্রির টাকা দেখোগে থলে ভর্তি করে গুঁজে রেখেছে কোমরে। তোমার ওই ডাঙা ভদ্রবাড়ির বেকার ছোঁড়াগুলোর চেয়ে খারাপ মক্কেল হবে না। ওগুলোকে কয়েকটা পাশ দিয়েছি—বাস তাতেই খুশি।...দাঁড়াও দাঁড়াও মাস্টার দাঁড়াও। ছট্‌স্ ও. কে। ঠিক আছে, ঠিক আছে মাস্টার, এই খেলাটা চালাও কাল ম্যাটিনিতে।...হাঁ, কি বলছিলুম বেলা ? ও, ওই বেকার ছোঁড়াগুলো...'

লালধারী এসে সেলাম ঠুকে বলে, 'ভাগা দিয়া হুজুর !'

তাঁবুর বাইরে শোনা যায় একটু মৃদু কোলাহল। যারা পাশ পেয়েছে ডাঙা জমিদারবাড়ির সেইসব গ্রাম্য বেকারের দল সার্কাস কোম্পানির পক্ষ হয়ে তর্জন শুরু করেছে লোকটার ওপর।

তারপর ছু'দিন দেখা গেল না ওদের। আসতে, যেতে, কাপড় মেলতে, বেলার চোখ অন্যমনস্কের মতো গিয়ে পড়ছে কাঁটাতারের বেড়াটার দিকে। না কেউ নেই।

কিন্তু ছুদিন পরে আবার চমকে উঠল বেলা ঃ ওরা এসেছে। আগের মতো অমন ঝাঁক বেঁধে নয় মাত্র জন ছুই তিন। কিন্তু তাকিয়ে আছে ঠিক সেই আগের মতো নির্বাক নির্বোধ দৃষ্টি মেলে।

খুব কড়া একটা ধমক দিতে চেয়েছিল বেলা। 'আবার এসেছো তোমরা ?'

ছু'তিনজনের পাতলা ভিড়টা চঞ্চল হল একটু। তারপর কে বললে, 'এই খানিক দেখছি গো ডাঁড়িয়ে ডাঁড়িয়ে।'

বোধ হয় বললে সেই লোকটা, যে বেলাকে এনে দিয়েছিল পলাশ ফুল।

'দেখছো? দেখতে চাও? এসো!' হঠাৎ ক্ষেপে ওঠে বেলা,... 'এসো দেখাচ্ছি, এ্যাই, এ্যাই লোকটা, এ্যাই গামছা কাঁধে লোকটা? এসো তুমি এসো ভেতরে, এসো দেখাই...'

কাঁটাতারের বেড়ার ওপাশে অস্পষ্ট গুঞ্জন উঠল বুঝি। তারপর সত্যি সত্যি বেড়া ডিঙিয়ে এগিয়ে এল লোকটা। শান্ত, গ্রাম্য কালো একটা মুখ, খালি গা, চওড়া মেহনতী মসৃণ পিঠ। কাঁধে গামছা। আর গামছার ওপর শক্ত পাকা একটি কুমড়ো।

বেলা লোকটার হাত ধরে হিড় হিড় করে টেনে ঢোকালো তাঁবুর ভেতরে। ছাখো, ভালো করে ছাখো!'

লোকটা তার গ্রাম্য চোখ তুলে তাকায় বেলার দিকে। তারপর সত্যি সত্যিই মুগ্ধের মতো দেখতে শুরু করে তাঁবুর ভেতরটা। একটা টিনের ট্রাঙ্ক। কয়েকটা কলাই করা বাসন। দড়ির ওপর রঙচঙে সাটিনের পোষাক। একটা ময়লা শাড়ি। কয়েকটা ছোট ছোট ফ্রক। জুতো।

বেলার গায়ের চামড়ার সঙ্গে এঁটে-বসে বেলার রোগাটে দেহের রেখাগুলোকে ফুটিয়ে তুলত যে লাল পোশাকটা, সেইটে ভয়ে ভয়ে নেড়েচেড়ে দেখে লোকটা। মুগ্ধের মতো বলে, 'এইটে তুমি পরো লয়? এইটো পরে তারে খেলা করো? এখুনো দেখা হয় নাই বাবু। দেখব একদিন। টিকিটের চড়া দাম চড়িয়ে দিয়েছে যে গো, ছ আনা।'

বেলা কথা বলে না। শূন্য দৃষ্টিতে সে শুধু চেয়ে থাকে লোকটার ঘর্মাক্ত পিঠটার দিকে।

এটা সেটা সব কটা পোশাক-আশাক নেড়েনেড়ে দেখে লোকটা। আন্দাজ করার চেষ্টা করে কোনটা কি রকম আশ্চর্য কি রকম দামী। তারপর যেন বেলাও অমনি আর একটা আশ্চর্য কোনো জিনিস এমনি ভাবে এসে স্থূল গ্রাম্য হাতে নেড়েচেড়ে দেখতে শুরু করে বেলাকে। মুগ্ধের মতো জিগ্যেস করে, 'বাঙ্‌লী মেয়ে বটো তুমি লয়? না বিশ্বেস হচ্ছে না।'

হঠাৎ কোথা থেকে একরাশ আলস্য এসে ছেয়ে ফেলে বেলাকে, একরাশ ক্লান্তি। তাঁবুর মাঝখানকার খুঁটিটায় ঠেস দিয়ে অন্যমনস্কের

মতো কোন একদিকে চেয়ে থাকে বেলা। কি বলছে লোকটা, কি করছে—কিছুতেই যেন এসে যায় না তার। কিছুতেই এসে যায় না বেলার, অনেক অনেক পথ পার হয়ে এসেছে সে, নিষ্ঠুর, নির্মম, ক্লান্তিহীন একটা প্রতিযোগিতা। নির্মম নিস্তরঙ্গ একটা যন্ত্রণা। সে প্রতিযোগিতা, সে যন্ত্রণার নাম জীবিকা। কেমন একটা বিবশ আলস্যে বেলার রোগাটে আনাড়ি শরীরটা নেতিয়ে পড়তে চাইছে আজ। অন্য-মনস্কের মতো বেলা বলে 'শোনো, ওই ফুল আরো এনে দেবে আমাকে?'

'পলাশ? কতো পলাশ লিবে তুমি?'

লোকটা ছেলেমানুষের মতো নেড়ে চেড়ে দেখছে সবকিছু। আর আলস্যে চোখ উদাস হয়ে আসে বেলায়।

'শোনো তোমাদের এ গ্রামটা বেশ! ভারি নিরিবিলি ভারি শান্ত।'

লোকটা নেড়েচেড়ে দেখে সবকিছু। তারপর জিজ্ঞেস করে, উ মেয়া ছুটি কার? তুমার? না, বিশ্বেস হচ্ছে না। মায়ের প্রাণ কাঁছুনো অমন হয় হে? আহা হা হা বড়া কাঁদে মেয়া ছুটি। বড়া মায়া লাগে বাবু বড়া মায়া লাগে....'

আর হঠাৎ চমক ভাঙে বেলার। মেয়ে ছুটোর কান্না সেও সইতে পারে না। কিন্তু তবু হাসতে হয় তাকে, ব্যানার্জীর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ধমক দিয়ে থামাতে হয় তাদের কান্না। কিন্তু সেকথা এই লোকটা বলবে কেন? কেন?

চমক ভেঙে বেলা হঠাৎ নির্লজ্জ নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে। এক মুহূর্তে গলার স্বর তার পালটে যায়। চিৎকার করে বলে, 'বাস খুব হয়েছে! এইবার পয়সা বার করো। পয়সা। আমার রেট কতো জানো তো, পাঁচ টাকা। বার করো শিগ্‌গির....'

ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায় লোকটা: পয়সা?

ন্যাকা! পয়সা না তো কি মাগনা! নির্লজ্জ ডাইনীর মতো বেলা ঝাঁপিয়ে পড়ে লোকটার ওপর। ওর গামছার খুঁট কোমরের গিঁট হাতিয়ে দেখে কি আছে। তারপর কিছু না পেয়ে ওর কাঁধের কুমড়োটা নিয়ে টানাটানি শুরু করে আক্রোশে, 'মজা পেয়েছো না, মাগনা?'

'পয়সা ফ্যালো শিগ্‌গির নইলে তোমায় দেখাচ্ছি…'

থতোমতো খেযে লোকটা কুমড়োটা ফেলে রেখে বোকার মতো পালিয়ে আসে তাঁবু থেকে।

আর তারপর হঠাৎ হু হু করে কাঁদে বেলা। কেন কাঁদে সে জানে না। তার সারা জীবনের সমস্ত কান্না হঠাৎ এই রাঢ় প্রান্তের অসহ্য নির্বোধ এক শান্তির যন্ত্রণা স্পর্শে উদ্বেল হয়ে ওঠে ক্লান্তিতে।

যেমন এসেছিল এক এক করে, তেমনি এক এক করে চলে যায়, যা যাবার। লটবহর, দড়িদড়া, খোঁটাখুটি, শিক-পাটাতন। ধূলিধূসর, চামড়া ঝোলা, চোখে-পিচুটি-পরা বেঁটে হাতীটা। বাঘের খাঁচা, রামছাগল, খোঁড়া ভালুক। তারপর খেলোয়াড়ের দল। এদিককার গ্রামাঞ্চলে যা পয়সা লোটবার তা লুটে সার্কাসটা চলেছে অন্য আর একটা গ্রাম্য গঞ্জের দিকে। একটা ট্রাক আছে। ট্রাকের সামনে বসেছে ব্যানার্জী। ট্রাকের পেছনে মেয়েরা। গ্রেট ন্যাশনাল সার্কাসের সবচেয়ে বড়ো আকর্ষণের জন্যে ব্যানার্জী ব্যবস্থা করেছে এই ট্রাকের সুবিধা। অন্য খেলোয়াড়রা কেউ চলেছে হেঁটে, কেউ মালের ওপর চেপে।

কিন্তু সবাই তৈরি হয়ে গেলেও বেলা বসেই রইল চুপ করে। চুপ করে বুকে জড়িয়ে রইল খুকি-টুকিকে।

ট্রাকে সামনের সীট থেকে নীল গগল্‌স্‌ পরা মুখটা ফিরিয়ে ব্যনার্জী বললে 'কই বেলা উঠে পড়ো শিগ্‌গির—'

বেলা উঠল না। ফিসফিসিয়ে বললে 'আমি যাবো না।'

'যাবে না!' তার মানে? নাও উঠে পড়ো শিগ্‌গির।'

'আমি যাবো না।'

'যাবে না?' ব্যানার্জী তিক্তকণ্ঠে গাল দিয়ে উঠলো ইংরেজিতে 'ওহ, ফেড্‌ আপ উইথ দেম। না যাবে, থাক পড়ে, স্টার্ট…'

গুরু গুরু করে ট্রাক দুলে উঠল। তারপর একরাশ ধুলো উড়িয়ে চলে গেল লোকাল বোর্ডের কাঁচা রাস্তা দিয়ে।

অন্যমনস্কের মতো বসেই রইল বেলা। কাঁটা তার, খোঁটাখুটি তাঁবু দড়ি সব শূন্য হয়ে গিয়ে জায়গাটায় দাঁড়িয়ে আছে শুধু সেই পলাশ গাছটা। চৈত্রের ছোঁয়ায় পাতলা হয়ে এসেছে তার পাতা। গিঁট গিঁট হয়ে বেঁকেছে ডালপালা। যেন অনেক সহ্য করা, অনেক লড়াই চলা রূঢ় বাঁকা হাড় খোঁচা কোনো এক হতভাগার কাঠামো। গিঁট গিঁট। গিঁটে গিঁটে লাল হয়ে উঠেছে একরাশ রক্তিম যন্ত্রণার মতো টক্‌টকে ফুল।

অন্যদিকে চোখ ফেরালো বেলা। নির্জন ছন্নছাড়া একটা গ্রাম। একটু দূরে একমাত্র মিষ্টির দোকানটা বন্ধ হচ্ছে। অসহ্য জীর্ণ লাগে সব কিছু। জীর্ণ আর অজ্ঞ আর ক্ষুদ্র। আর এই জীর্ণতার মাঝখান থেকে ওরা এখনো তাকিয়ে আছে। কাঁটাতারের বেড়াটা নেই— তবু নির্বোধ-নির্বিকার কালোকুলো নানানবয়সী একসার মুখ অনেক দূর থেকে ওকে দেখছে।

আর কিছুক্ষণ পরেই সন্ধ্যা হয়ে আসবে। বেলা তাড়াতাড়ি খোঁচা দিয়ে জাগিয়ে তোলে খুকি-টুকিকে ঃ ছোট্‌ ছোট্‌ শিগ্‌গির। ট্রাকটা এখনো বেশি দূর যায়নি। দৌড়ে গিয়ে নাগাল ধরতে হবে ওদের।'

চোখ মুছে খুকি-টুকি ছুটতে থাকে সামনের দিকে। খুকি-টুকির পেছনে বেলা। লোকালবোর্ডের কাঁচা রাস্তায় টাল খেতে খেতে ঃ ধূলো উড়োচ্ছে ট্রাকটা।

প্রতিদ্বন্দ্বী

উৎসবের জন্য থানাটাও প্রস্তুত হচ্ছে। থানার মধ্যেকার প্রত্যেক দিনকার ব্যস্ত কাঠিন্যের মাঝখানেও যেন একটু গা-ছেড়ে দেওয়া আলস্যের ভাব এসেছে। আসামীর আনাগোনা কম। যারা তবুও আসে, তাদের প্রতি মনোযোগটা তেমন কড়া হয়ে ওঠে না।

থানার তরুণ অফিসার অমলকান্তি এসেছে পুলিস পোশাক বাদ দিয়েই—ধুতি পাঞ্জাবি পরে।

সাজাবার ব্যাপারটা নিয়ে মেজোবাবু খুবই বিব্রত বোধ করছিলেন। অমলকে দেখে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন—'এই যে, ভায়া! এ তোমাকে নিতে হবে ভারটা। বড়বাবু চলে গেছেন, এখুনি আবার আসবেন। তার আগে সব ঠিক করে ফেলতে হবে। এসব কি আমার দ্বারা পোষায়?'

অমল জানায়, 'আজ তো আমার ছুটি! তবে অবিশ্যি—'

অমলের চেহারাটা সুন্দর। বেশ সুন্দর চেহারা। কোমল ফর্সা রং, পাতলা দোহারা গড়ন। এলোমেলো কোঁকড়া চুল। পল্লবঘন একজোড়া শান্ত চোখ। সুগঠিত ঠোঁটের ওপর মোচ ছাঁটাব ধরনটাই শুধু কর্কশ। তরুণ পুলিস সাব-ইনস্পেক্টারদের মহলে চালু ফ্যাশন অনুসারে তীর্যকভাবে সূক্ষ্ম এবং শানিত।

প্রতিদিনকার অভ্যস্ত সাদা ইউনিফর্মের বদলে ধুতি পাঞ্জাবিতে একেবারে আশ্চর্য সুন্দর দেখাচ্ছে অমলকে। মেজোবাবুও খানিকটা অবাক না হয়ে পারেন না। তারপর কোন প্রসঙ্গ না তুলেই কি ভেবে

বলেন, "নাঃ বেশ মানিয়েছে তোমায়। তোমাদের কথা ভায়া আলাদা। আমরা সাংসারিক মানুষ....'

অমল সহৃদয়ভাবে হাসে,—'কী বলছেন মেজোবাবু!'

'না, ভাবছিলাম, তুমি এ-লাইনে কেন এলে? এখানে তোমায় বাপু মানায় না'—মেজোবাবু বলেন অপ্রতিভভাবে।

'তা ঠিক'—অমল অন্যমনস্কভাবে বলে। নরম চুলটা হাত দিয়ে একবার পালিশ করে নিয়ে সিগারেট ধরায় একটা। ছুটির ভাবটা ফুটিয়ে তুলে চেয়ারে না বসে, বসে টেবিলের কোণায়।

ছুটির দিন হলেও কাজ একেবারে আসে না তা নয়। আইন এবং শৃঙ্খলার ছুটি নেই। মাঝে মাঝে ধরে নিয়ে আসে পেটি কেস। কোন রিক্সাওলা, নয়তো ফেরিওলা, নয়তো ছোট খাটো মারপিটের মামলা। আসামীরই কাঁধের গামছাটা দিয়ে পাকিয়ে পাকিয়ে পিছমোড়া করে বেঁধে এনেছে কাউকে।

মেজোবাবু ভোঁস ভোঁস করে নস্যি টানেন। সাদা ইউনিফর্মের ওপর নস্যির গুঁড়োগুলো লেগেই থাকে। চেয়ার থেকে একনজর আসামীদের দিকে তাকিয়ে অমলকে মিনতি করেন, 'দেখো তো ভায়া ওদের কেসগুলো একটু দেখো তো।'

কোন কোন কেস এমনিতেই ছেড়ে দেয়। কোন কোনটা নিয়ে একটু কড়া ব্যবহারের দরকার হয়। একটু দূরে সিপাহী ব্যারাকের ময়দানে ল্যাঙট পরে ডন দেয় একটা মোটা সেপাই। তার ডাক পড়ে। সোনা বাঁধানো দাঁতের ফাঁকে খইনী গুঁজে সে এসে ঝাঁকি দেয় আসামীর ঝুঁটি ধরে।

থানার সমস্ত আবহাওয়ার মধ্যে আসামীরা কেমন যেন হঠাৎ অমলকে দেখেই একমাত্র স্বস্তি পায়। অসহায় নির্ভরতায় পা জড়িয়ে ধরে অমলের—'কুছ কসুর নেহি হুয়া বাবুজী, কুছ নেহি—'

অমল তার পল্লবঘন চোখটা সরিয়ে নেয় ক্লান্তিতে। বলে, 'মেজোবাবু,—এ আমি পারবনা – আপনি দেখুন—'

এ সব ক্ষেত্রে মেজোবাবুর উৎসাহ অপরিসীম—'না, না, আরো ঘা কতক দিতে হবে। তুমি পারবে না, আচ্ছা আমি দেখছি—'

উন দেওয়া সেপাইটা আর মেজোবাবু শিকার ধরার মত করে ধরেন আসামীকে। অমল ঘাড়টা ঝাঁকিয়ে একটু দূরে গিয়ে অন্যদিকে তাকায়।

কিন্তু আসামীর কাছে মেজবাবু যথেষ্ট কড়া হলেও উচ্চপদস্থ অফিসারের কাছে যেতে এখনো অনভিজ্ঞ কেরানীর মত তিনি ইতস্তত করেন, পদে পদে ভুল করেন।

মাঝে মাঝে টেলিফোন বাজছে। খড়ম পায়ে দিয়ে অফ-ডিউটি সেপাহীরা যাতায়াত করেছে মাঝে মাঝে। হঠাৎ শোনা যায় বড়বাবুর ঘর থেকে বাজখাঁই গলার আওয়াজ—'ফাইলটা চেয়েছিলুম—ফাইলটা কই—' কেরানী দুজনার সঙ্গে সঙ্গে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন মেজোবাবু! ব্যস্ততার ঝোঁকে উলটে পড়ে কয়েকটা পেপার ওয়েট, ট্রে! কতকগুলো কাগজপত্র নিয়ে ব্যস্তসমস্ত মেজোবাবু আর তাঁর পেছনে একটা খাতা নিয়ে একজন কেরানী ছুটে যান বড়বাবুর ঘরে। কিন্তু নির্ঘাৎ কোন একটা ভুল হয়। বড়বাবুর ঘর থেকে শোনা যায় ক্রুদ্ধ আওয়াজ —'কিছু হবে না আপনাদের দিয়ে—সেই ফাইলটা কই! এটা কে চেয়েছে?'

মেজোবাবু ভিতরে আসেন মুখ শুকনো করে। অমলকে দেখে বলেন —'ভায়া, তুমি একটু দেখো—'

অমল হাসে—'আমি এই পোশাকে—আমার যে অফ—'

'তা হোক—দেখ ভাই দেখ একটু—'

যে কোন কারণেই হোক, অমল গেলে বড়বাবু শান্ত হয়। বড়বাবুর ঘর থেকে চিৎকারের বদলে সাধারণ কথাবার্তা শোনা যায়। অমল ফিরে আসে যেন কিছুই হয়নি। যে কাজটার জন্য মেজোবাবুর এত ভয়, সে কাজটার মত সোজা জিনিস পৃথিবীতে আর নেই। অমল তার অভ্যস্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে জানায়—'যত্ত ঝামেলা—'

মেজোবাবু নস্যি টানেন ভোঁস ভোঁস করে। তারপর বিব্রত এবং বিস্মিত এবং ঈষৎ ঈর্ষান্বিতভাবে হাসেন—'ইয়ং ম্যান! তোমরা আজকালকার, ভায়া! তোমরা এসব পারো! আমাদের সময়ে এত

কোয়ালিফিকেশনের কোন বালাই ছিল না! আমরা সাংসারিক মানুষ··' অমল সহৃদয়ভাবে হাসে—'নিন, সিগারেট নিন একটা···'

মেজোবাবু সিগারেটটা টানতে টানতে কেন জানি একজন কেরানীকে বোঝাতে শুরু করেন—'হ্যাঁ আমরা সাংসারিক মানুষ। এই কম্পিটি-শনের বাজার। আমাদের আর উন্নতির আশা নেই। বুঝলেন না?···' এরই মাঝে তোড়জোড় চলে উৎসবের। খড়ম পায়ে দেওয়া রিজার্ভের কতকগুলো সেপাই লেগে গেছে সাজাতে। অমল একরাশি কাগজের শিকলী আর ফুলের মধ্যে দাঁড়িয়ে সিগারেট-ধরা আঙুল দিয়েই নির্দেশ দেয় কি করতে হবে। মেজোবাবু সাজাবার ভারটা অমলের ওপর দিয়েও কিন্তু নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন না। হস্তক্ষেপ করার জন্য মাঝে মাঝে চেয়ার থেকে ছুটে আসেন—'আহ্ হাহা—এগুলো এখানে লাগাচ্ছ কেন? এ কি ভালো দেখাবে?'

সেপাইগুলো জানায়, 'অমলবাবু বললেন··'

মেজোবাবু ধমক দিয়ে ওঠেন 'ছাই! তোমাদের দিয়ে যদি একটা কিছু হয়! দেখি দেখি' বলে, নিজের মনোমত একটা স্থূল ডিজাইন বোঝাতে শুরু করেন। আমি যখন ইস্কুলে পড়তাম, তখন বুঝলে ভায়া, একবার প্রাইজের সময় আমাদের ইস্কুলটা যা সাজানো হয়েছিল, বুঝলে ভায়া সেই রকম করতে হবে—' বলে আত্মসন্তুষ্টভাবে কাজে লাগেন। কিন্তু অনেকক্ষণ চেষ্টা করেও কোন ডিজাইনই স্পষ্ট হয়ে ওঠে না! সেপাহীগুলো বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।

অমল এসে জানায়, 'মেজোবাবু এইটে এইখানে দিন, আচ্ছা ছেড়ে দিন—আমি খানিকটা করে দেখাই, তারপর বলুন আপনার পছন্দ হচ্ছে কিনা···'

মেজোবাবু ছেড়ে দিয়ে গিয়ে ক্ষুণ্ণমনে আবার বসেন চেয়ারে। কিছুক্ষণ বাদেই দেখা যায় আপন মনেই তারিফ করতে শুরু করেছেন—'হাঁঃ হাঁঃ, এ্যাই এই রকমই তো আমিও বলছিলাম। এ্যাই বুঝলে ভায়া; এইটাই আমিও বলছিলাম!'

অমল সহৃদয়ভাবে একটু হাসে। তা দেখে মেজোবাবু খুশী হন না দুঃখিত হন বোঝা যায় না। বিব্রতভাবে কৈফিয়তের স্বরে বলেন, 'আমরা সাংসারিক মানুষ। সেইজন্যই তো সাজাবার ভারটা দিলাম—'

এই সময়ই ধরা পড়ে এসেছিল জানমহম্মদ।

মেজোবাবু অভ্যাসমতই ওর দিকে বিশেষ না তাকিয়েই দুটো লাথি মারলেন। তারপর রিপোর্ট লিখতে লিখতে জিজ্ঞেস করলেন—'নাম ?'

'জানমহম্মদ।'

'ঠিকসে বোলো—'

'বাবু ?' একটা অদ্ভুত গলায় জানমহম্মদ জিজ্ঞেস করলে।

'ঠিকসে বোলো'—জানমহম্মদের দিকে আর একটা নিশ্চিন্ত লাথি মারতে গিয়েই মেজোবাবু আঁতকে উঠলেন রীতিমত—'শালা! ইকিরে বাবা!'

আঁতকে ওঠার কারণ জানমহম্মদের চেহারা। মেজোবাবুর অন্যমনস্ক দুটো লাথি খেয়ে তৃতীয় লাথি খাবার অপেক্ষায় তখন জানমহম্মদ তাকিয়েছিল মেজোবাবুর দিকে। খোলা গা, পরনে একটা ডোরাকাটা খয়েরি ময়লা লুঙ্গি। কোমর থেকে পায়ের দিকটা তুলনায় কেমন যেন ছোট। ওপর দিকটা বেখাপ্পা রকম লম্বাটে। লাথি খাবার পর কেন জানি ও বসে পড়েছিল টেবিলের পাশে, হামা দিয়ে। বসে থাকার ভঙ্গিটার মধ্যে মিল রয়েছে কোন একটা প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীর। হামা দিয়ে বসা, বাঁকা সর্পিল ভঙ্গিতে নুয়ে আসা লম্বাটে নগ্ন উর্ধ্বাঙ্গের শেষ প্রান্তে পেশল গর্দানের ওপর এক উর্ধ্বদৃষ্টি কদর্য মুখ।

সে কদর্যতা এমনি আলাদা করে বিচার করলে বিশেষ কিছু বলার নেই। সাধারণ ন্যাড়া মাথা, সাধারণ বোঁচা নাক, পুরু একজোড়া ঠোঁট। কিন্তু সব মিলিয়ে বিশেষ করে হ্রস্ব ভ্রূহীন কপালের দুই পাশে অসম্ভব বড় গোলাটে সাদা দুই চোখের চারপাশে এই সমস্ত প্রত্যঙ্গগুলো এমন এক অসঙ্গতি সৃষ্টি করে যার অতিপ্রীকর প্রতিক্রিয়া সহজে ভোলা যায় না।

'শালা, চেহারা কিরে বাবা!' মেজোবাবু আরো কয়েকটা লাথি মারতে গিয়েও মারতে পারলেন না। জানমহম্মদ মেঝের ওপর থেকে একই রকম ঊর্ধ্বদৃষ্টি হয়ে আবার বললে 'বাবু!'

ওর প্রকাণ্ড অমসৃণ দুই চোখে হঠাৎ মনে হয় বুঝি ঈষৎ বিদ্রূপ ঝলকিয়ে উঠেছে। আবার পরক্ষণে মনে হয়, বোধ হয় চোখের ভুল। ভূতলশায়ী জিনিসটা সম্ভবতঃ এক নিতান্ত অর্ধমানব অপোগণ্ড ছাড়া কিছু নয়। মেজোবাবু আপন মনে বিড় বিড় করতে করতে হুকুম দেন—'দরোয়াজা! হাজত···শালার মুখ কিরে বাবা! একটা আস্ত ঘুঘু, ও মেরে কিছু হবে না—শালার চেহারা কিরে বাবা!'

'হো-হো-হো-হো-হা হাউ!' হাজতের মধ্যে ঢুকে এক মৃদু কিন্তু অদ্ভুত রকম বিকৃত শব্দ করে হাসল জানমহম্মদ। হাজতে পাহারা সেপাহীটা তালা বন্ধ করতে করতে ধমকে উঠল—'এই কেয়া হোতা হ্যায়?'

জানমহম্মদ তার বিরাট মুখ বিস্ফারিত করে বিনীতভাবে হাসল—'আমাকে মারলে না। ছেড়ে দিলে; বললে কি লে যাও—'

'তো ইসমে হাসনেকা কারণ কেয়া হ্যায়।' ওর অপ্রীতিকর হাসিটা থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে সেপাহীটা তালাবন্ধ করে সরে গেল।

'কারণ কেয়া হ্যায়।' জানমহম্মদ কি ভাবে আপন মনে ওর কথাটারই পুনরাবৃত্তি করল একবার। তারপর অন্ধকার হাজতটার এমোড় থেকে ওমোড় পর্যন্ত ঘোরাঘুরি করে নিল খাঁচায় পোরা এক জন্তুর মত। সংকীর্ণ হাজতটার একপাশে উঁচু দেওয়ালের গর্তে শিকগাঁথা একটা কৃপণ গবাক্ষ। বাইরে থেকে প্রথমে ঢুকলেই অন্ধকারে সমস্তটা আবছা দেখায়। আবছার মধ্যে চোখে পড়ে কয়েকটা নোংরা ঠোঙা, চা খাওয়া ভাঙা মাটির খুরি। অন্ধকারের মধ্যে মিশে পড়ে আছে কয়েকটা এলোমেলো ধুলোভর্তি কালো কম্বল।

ওই কম্বলগুলোর মাঝেই এ কোণে ঢাকা দিয়ে শুয়ে আছে জুতো মোজা পরা একটা ফিরিঙ্গি সাহেব।

জানমহম্মদ এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করে নিঃশব্দে খোঁচা দিল ঘুমন্ত সাহেবটাকে !—'স্মোক সাব সিগারেট—' ফিরিঙ্গি সাহেবটা জেগে উঠে মৃদুভাবে ককিয়ে উঠল খানিক। যন্ত্রণায় মুখটা বিকৃত করে ইশারায় জানাল—মেরেছে ভীষণ মেরেছে, সারা গা হাত পায়ে ব্যথা···

'কৌন মারা, পুলিস ?' ভাঙা গলায় ফিস ফিস করে জিজ্ঞেস করে যেন জানমহম্মদ।

সাহেবটা চোখ বুঁজে মাথা ঝাঁকাল, না। তারপর হড়বড় করে কোন এক অজানা শত্রুর উদ্দেশ্যে গালাগালি দিতে লাগল—'সোআইন।···কিস্‌ড মাই ওয়াইফ এণ্ড বিট মী···বোথ অফ্ দেম··· মেক্‌স্ লাভ টু মাই ওয়াইক্···সোআইন !'

টুকরো ইংরাজিগুলো জানমহম্মদ বুঝল কিনা কে জানে। মুখ বিস্ফারিত করে মৃদুভাবে হেসে উঠল—'হো হো হো—হা হাউ···'

সাহেবটা এতক্ষণ চোখ বুঁজেই ছিল। হাসি শুনে হঠাৎ চমকে উঠল। অন্ধকারে প্রথম দেখল জানমহম্মদের মুখটা। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে সে মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে, নকারবোধক একটা ঘাড় ঝাঁকুনি দিয়ে আবার শুয়ে পড়লে আগাগোড়া কম্বল মুড়ি দিয়ে।

জানমহম্মদ হাসি থামিয়ে হাত পাতল—'সাব সিগারেট—'

যেন পরিত্রাণ পাবার আশায় সাহেবটা কম্বলের থেকেই ছুঁড়ে দিল একটা সিগারেট। জানমহম্মদ সেটি কুড়িয়ে নিয়ে আবার মৃদুভাবে হাসল। সে হাসি নির্বোধের না বিদ্রূপের হঠাৎ বোঝা যায় না। কোণা থেকে একটা দেশলাইয়ের চটা বার করে সিগারেটটি ধরালে। অর্ধেক খেয়ে নিভিয়ে রেখে নিস্পৃহের মত সরে এল শিক দেওয়া দরজাটার কাছে। শিকের ওপর মুখটা রেখে আধ-শোয়া অবস্থায় পড়ে রইল মেঝের ওপর।

হাজতের দরজা বন্ধ হওয়ার সঙ্গে দুটো জগৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। একটার তুলনায় অন্যটা অবাস্তব লাগে। থানার অভ্যন্তরে যারা

হাঁটাহাঁটি করে তাদের মুহূর্তের জন্যও মনে পড়ে না, এইখানেই আরো কতকগুলো মানুষ রয়েছে, অপেক্ষা করছে, ভাবছে, ফিস্‌ফিস্ করে কথা কইছে।

শিকের ওপর মুখটা কাছিয়ে এনে শুয়ে থাকলেও বাইরের মুক্ত মানুষের দৃষ্টি সেদিকে সহজে পড়ে না। দেখা যায় লোক হেঁটে যাচ্ছে। দরজার কাছ দিয়ে যখন হেঁটে যায় তখন তার পুরো চেহারাটার চেয়ে বড় হয়ে চোখে পড়ে শুধু পাগুলো। দেখা যায় চলন্ত সেপাহীর বুট, বুটের নীচে কালো সোলের মাঝে লোহার কাঁটার ঝলক, চোখে পড়ে পায়ে জড়ানো পট্টির ওপর শক্ত লোমশ হাঁটু আর উরু।

থানার অভ্যন্তরের সবটা এখান থেকে নজরে পড়ে না। দরজাটার সামনে সরাসরি দেখা যায় মেজোবাবুর টেবিলের চারপাশে চেয়ার বেঞ্চিগুলো। বড়বাবুর ঘর এবং বাইরের গেট দেখা যায় না। হাজতের সামনে দিয়েই আড়াআড়িভাবে একটা পথ। একপ্রান্তে বাইরের গেট এবং অন্যপ্রান্তে সিপাহীদের ব্যারাকে যাবার পথ।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঐ একই ভাবে পড়েছিল জানমহম্মদ। আজ আদালত ছুটি, কেস উঠবে না। তাই আজ থানাহাজতেই থাকতে হবে। কেস উঠলে হয় জেল-হাজতে, নয় জামীন। থানা-হাজতের চেয়ে এ দুটোই ভালো। ছুটির দিন বলেই বোধ হয় আসামীর আমদানিও কম। সাহেবটা অমনি ভাবেই ঘুমুচ্ছে। মাঝে মাঝে ককিয়ে উঠছে। মুখ বার করে যন্ত্রণায় ককাচ্ছে। তখন মৃদু একটু মদের গন্ধ বেরুচ্ছে মুখ দিয়ে—অনেক আগে মাতাল হবার অনেকক্ষণ পরেকার গন্ধের রেশটুকু। সাহেবটা ছাড়া আর একজন মাত্র আসামী এসেছে এতক্ষণের মধ্যে—বছর সতের আঠার বয়সের একটা ছোঁড়া। কুচকুচে কালো রং। ছোট কালো চোখ দুটো চক্‌চক্ করে অনবরত। কখনো ভয়ে, কখনো নির্বোধ ঔৎসুক্যে।

জানমহম্মদ শুধু একবার জিজ্ঞেস করেছিল, 'কী কেস ?'

কেসের বিবরণ দেবার বদলে ছোঁড়াটা হড়বড় করে বোঝাতে শুরু করল—তার কোন দোষ নেই। কেমন করে বাড়ির সঙ্গে তার ঝগড়া

হয়েছিল। বাপ কাজ করে দপ্তরীর দোকানে, কেমন করে বাপ তাড়িয়ে দেয়—রোজগার করে না বলে। কেমন করে বাড়ির ওপর রাগ করে নিজেই গেঞ্জি সাবান ফিরি করতে শুরু করে। আমি বাপকে দেখিয়ে দিব তোমার রোজগারে পরোয়া করি না, ইত্যাদি···

'কী কেস? নাম কি তুমহার?'

'কালাচাঁদ দাস। কেস? কে জানে; ধরে নিয়ে এসেছে শালারা! কেন আমার মাল কি চোরাই মাল আছে, তবে? তবে শালা ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঘুষ দিতে হবে কেন?'

জানমহম্মদ নিস্পৃহভাবে জিজ্ঞেস করে, 'বিড়ি আছে?'

কালাচাঁদ বলে, 'না, সব তল্লাশী করে রেখে দিয়েছে।' তারপর আবার তার বাবার অন্যায়, ওর ব্যবসার ভবিষ্যৎ ইত্যাদির কাহিনী শুরু করে উত্তেজিতভাবে। জানমহম্মদ ঘোঁৎ করে এক ধমক দেয়—'শালা, বিড়ি নাই, তো ইদিকে ফুটানী দেখো। বিড়ি নাই তো এসবের মধ্যে এসেছো কেন বাবা···ঘরের ছেলে ঘরে চলে যাও—হাঁ—'

কালাচাঁদ চটে উঠেছিল 'এ্যাই! শালা বলছ যে?'

'যা যাঃ' বলে জানমহম্মদ নিস্পৃহভাবে আবার তাকিয়ে থাকে শিকের ওপর মুখ রেখে। কালাচাঁদ ব্যাপার দেখে আধা ভয়ে আর আধা স্পর্ধায় খানিক আপন মনে গজরিয়ে তারপর বাধ্য হয়ে সেই থেকে চুপ করে থেকেছে। অনেকবার কথা বলার ইচ্ছে হয়েছে কারো সঙ্গে। কিন্তু জানমহম্মদের মুখের দিকে যতবারই ও তাকিয়েছে ততবারই কথা বলার শখটা ওর উড়ে গেছে। আর সমস্ত রাগটা গিয়ে পড়েছে ওর দপ্তরী বাপের ওপর। বিড়বিড় করেছে,—'তোমার পয়সা খেয়ে আমি থাকব? তেমন ছেলে আমি নই—রোজগার করতে পারি কিনা দেখিয়ে দিব—ই কেস কদিন। সারা জীবন তো জেলে রাখতে পারবে না—তবে?'

হাজতের মধ্যে থেকেই চোখে পড়ে থানার ভেতর তোড়জোড়টা বেড়ে উঠেছে।

একটা সেপাহী কতকগুলো ডালপালা ভেঙে নিয়ে এসেছে কোথা থেকে। অমলকান্তির কাছে অনুরোধ জানায়—'এগুলো দিয়ে সাজান বাবু, খুব ভালো হবে…'

অমল সহৃদয় ভাচ্ছিল্যে হেসে বলে, ওগুলো দিয়ে তোমাদের ব্যারাকটা সাজাও '

সেপাহীটা গাঁই গুঁই করে 'কিন্তু স্যার ভালো হত দেখতে—'

মেজোবাবু নস্যি টানছিলেন। ছুটে আসেন—'হ্যাঁ হ্যাঁ এই যে, ওহে। কী পাতা ওগুলো? আমাদের স্কুলে একবার প্রাইজ হয়েছিল, বুঝলে অমল, তা দেবদারু পাতা দিয়ে যা সাজিয়েছিল…দেখি দেখি দেখি কী পাতা?'

অমল কাগজের কতকগুলো চীনা লণ্ঠন আর রঙীন ফুল নিয়ে চলে যায় গেটের দিকে—'এই যে একজন এসতো, জলদি…'

মেজোবাবু আর একবার বিব্রতভাবে বলেন—'কিন্তু দেবদারু পাতা দিয়ে যা সাজিয়েছিল, খুব খারাপ হয়নি….'

জানমহম্মদ বসে থেকে হঠাৎ জিজ্ঞেস করে দারোয়াজাকে—'বাপরে বাপ্ কেয়া হোতা হ্যায়—'

'দরোয়াজা' সেপাই অবজ্ঞাভরে তাকায়—'নহি জানতে হো, কেয়া? আজ ২৬ জানবাড়ী—উ কেয়া বোলা যাতা হ্যায় রিপাবলিক ডে—আজ তো হিন্দুস্তান পুরা আজাদ হো যায়ে গা'—

'আচ্ছাহ্?' ভাঙা গলায় জানমহম্মদ বিস্মিত তারিফ করে। তারিফ করে কি বিদ্রূপ করে, বুঝতে না পেরে সেপাহীটা বিরক্তিকর মুখভঙ্গি করে সরে যায়।

'আজাদীকা দিন, তো বহুৎ খরচা ভি হোগা'—বলে জানমহম্মদ চোখ বড় বড় করে কালাচাঁদের দিকে একবার কি ভেবে তাকায়। কিন্তু তার কাছ থেকে কোন উত্তর শোনার আগেই হঠাৎ চোখে পড়ে কতকগুলো রিক্সাওলাকে ধরে আনা হয়েছে। দরজার সামনে দিয়ে কেউ, বিশেষ করে ভদ্রবেশী কেউ, হেঁটে গেলেই জানমহম্মদ শিকে মাথা রেখে এতক্ষণ মৃদু ভাঙা গলায় মাঝে মাঝে ঘেঙিয়ে উঠছিল—'বাবু!

বাবু! সেলাম বাবু। একটা বিড়ি, বাবু!' বিড়ি না দিলে আপন মনেই বিড় বিড় করে গালাগালি দিচ্ছিল। সে ঘেঙানি কেউ শুনতে পাচ্ছিল না, কেউ শুনতে পেয়েও না শোনার ভান করছিল। কিন্তু গরিব গোছের `এই আসামীগুলো দেখেই জানমহম্মদ হঠাৎ মিনতির বদলে ধমক দিতে শুরু করল সরাসরি এবং সজোরে—

'এই শালা! বুদ্ধু হ্যায় না কেয়া? এ-শালা! বিড়ি দে দো দোঠো! দেখ্ দেখ্ শালাকো, আরে বাবা দারোগাবাবু তোমায় খেয়ে লিবে না কি?'

ভদ্রলোকেরা তবু মাঝে মাঝে দু-একটা বিড়ি যদি বা ছুঁড়ে দেয়, এই ধরণের গেঁয়ো উজবুক লোকগুলো বিড়ি দেবে কোথায়, অফিসারের সামনে দাঁড়িয়ে ভয়ে কাঁপে।

থানা সাজিয়ে তোলার তাড়াতাড়িতেই বোধ হয় রিক্সাওলাগুলো আর হাজত পর্যন্ত এল না। টেবিল থেকেই ছাড়া পেয়ে চলে গেল।

অমলকান্তি বাইরে থেকে ফিরে আসে, 'ফিনিস্‌ড্'।

'হয়ে গেল?' মেজোবাবু ঘোরাঘুরি করে একবার চারদিকটা দেখে নেন। সুইচ জ্বালিয়ে পরখ করেন নতুন লাগানো বাল্বগুলো ঠিকমত জ্বলছে কিনা। তারপর না প্রশংসা না নিন্দা গোছের একটা অপ্রতিভ শব্দ করেন—হ্যাঃ। 'তোমার গুণ আছে হে তুমি এসব লাইনে কেন এলে' বলে তাকান অমলের দিকে। একজন ভদ্রলোক তার প্রতিদ্বন্দ্বীর দিকে যেভাবে তাকাতে পারে তেমনি ভাবে।

'আমি চললাম, ঠিক সন্ধ্যের সময় ফিরব…' অমল সিগারেট ধরিয়ে হেঁটে যায় হাজতের দরজাটার সামনে দিয়ে। জানমহম্মদ বসে ছিল শিকে মাথা রেখে। অভ্যাসমত হঠাৎ ঘেঙিয়ে উঠল 'বাবু! বাবু! একটা বিড়ি বাবু…' দারোগা অফিসারদের কাছে সরাসরি বিড়ি চাওয়া স্পর্ধার ব্যাপার। বিড়ি চাইতে হলে চাইতে হয় লুকিয়ে বাইরের লোকের কাছে। কালাচাঁদ ওর ব্যাপার দেখে চমকে উঠল—'শালা মার খাবে নির্ঘাৎ…'

অমলকান্তি [illegible] দিকে একবার তাকিয়ে পিছন ফিরল। আপন মনে হেঁটে চলে গেল দরজার সামনে দিয়ে। যতক্ষণ অমল তাকিয়েছিল, ততক্ষণ জানমহম্মদ কিছু বলেনি। কিন্তু যেই বিড়ি না দিয়ে অমল পিছন ফিরেছে, অমনি অভ্যাসমত বেপরোয়া গাল দিয়ে উঠল জানমহম্মদ—'শালা! খানকীর বেটা! বিড়ি একটা ফিকে দিলে কি শালাদের নোকরি চলে যাবে না কি।…'

জানমহম্মদের গালাগালির স্বরটা এত উঁচু নয় যে সকলেই শুনতে পায়। কিন্তু এত আস্তেও নয় যে অমল শুনতে পাবে না। জানমহম্মদের ব্যাপার দেখে থমকে গেল কালাচাঁদ। তারপর অমল যখন কিছু না বলেই অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে চলে গেল তখন, জানমহম্মদের সঙ্গে কথা বলবে না ঠিক করলেও না বলে পারল না। খুক খুক করে হাসতে শুরু করল কালাচাঁদ, 'শালা ইকিরে বাবা। শালার ওর ভয় ডর নেই? ই আচ্ছা ইয়ে তো! হি হি হি…'

জানমহম্মদ নিঃশব্দে ঘেণ্ডিয়ে হাসে—'তবে? তবে শালাকে আর কি বলা যায়!'

তারপর হঠাৎ হাসি থেমে যায় ওদের।

অমল এসে দাঁড়িয়েছে একেবারে হাজতের দরজার কাছে। অমলের পেছনে হাজতের সেপাহীটা। কালাচাঁদের মুখটা শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে ভয়ে। অমল আবছায়া হাজতটার মধ্যে স্থির দৃষ্টিতে তাকাল। তাকাল কালাচাঁদের দিকে, তারপর জানমহম্মদের মুখের দিকে। কিছুক্ষণের জন্য নিঃশ্বাস বন্ধ করে রইল ওরা দুজন। তারপর কি ভেবে কাঁধের একটা নঙ্কারবোধক ঝাঁকুনি দিয়ে হাতের সিগারেটটা অমল ছুঁড়ে দেয় ভেতরে। তারপর কিছু না বলেই চলে যায়।

হাঁপ ছেড়ে কালাচাঁদ আবার খুক খুক করে হাসতে শুরু করে দেয়, 'শালা! যা ভয় লেগেছিল, কিন্তু বাবুটার শালা চেহারা মাইরী বেড়ে সোন্দর! বাবুটা খুব ভালো মাইরী!…'

হাজতের সেপাহীটা কাছে আসে। অভ্যস্ত কড়া হুকুমের ভঙ্গির বদলে একটু ঘরোয়া দরদ দেখিয়ে বলে—'হাঁ লেও লেও! হুজুর

আপনার হাঁতসে দেদিয়া তো ডরনেকো কেয়া হ্যায়। তোম দোনো মিলকে পী লেও। সমঝা? আজ ২৬ জানবাড়ী হ্যায় নেই? মারপিট মাৎ করনা। তোম দেনো মিলকে পী লেও...' মেজো বাবু চেয়ারে বসে ফাইল নাড়াচাড়া করছিলেন। সেপাহীর কথাটা অর্ধেক শুনেই কি ভেবে তিনিও সজোরে মন্তব্য করলেন—'হাঁ! রিপাবলিক ডে। হিন্দুস্তান পুরো স্বাধীন হল আজকে। বুঝলে? স্বাধীন তো ধরো দু বছর আগেই হয়েছে। কিন্তু আজকে সেইটা পুরোপুরি আইন করে চালু হল। • বুঝলে?'

জানমহম্মদ সিগারেট টান দেয় লুব্ধের মত। তারপর বিরাট মুখব্যাদন করে হাসে—'রিপাবলিক ডে!'

সেপাহীটা ওর হাসি দেখে অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভুরু কোঁচকায়—'হাঁ, হাঁ, আজাদীকা দিন...'

সিগারেটে আর একটা টান দিয়ে আবার হাসে জানমহম্মদ—'আজাদীকা দিন?'

কালাচাঁদ বেসামাল হয়ে তখনও খুক খুক করে হেসে যাচ্ছিল।

জানমহম্মদ হঠাৎ গর্বিতভাবে খোঁচা দেয় কালাচাঁদকে 'উ দারোগাটার চেহারাটা খুব সুন্দর আছে না? তাই আমাকে দেখে ডর হয়ে গেল উর। মারলে না, হো-হো-হো হাউ—'

কালাচাঁদ অস্বস্তিভরে জানমহম্মদের কুৎসিৎ নির্বোধ মুখটার দিকে তাকায়। কী বলতে চায় জানমহম্মদ?

হাজতের মধ্যে ধীরে সন্ধ্যা ঘন হয়ে উঠছে। সাহেবটা উঠে বসে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে ঝিমোচ্ছে। নোংরা ঠোঙা আর ভাঙা খুরিগুলোর ওপর এক চিলতে আলো এসে পড়েছে ইলেকট্রিক বাল্‌বের। কোণে হঠাৎ যেন একসঙ্গে অজস্র মশা কম্বল থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে উঠে গুঞ্জন শুরু করছে।

হাজতের শিকে কালাচাঁদও চোখ রেখে বসেছিল। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল—'আরে বাবা! শালার কত আলো লাগিয়েছে!'

'রোশনাই!' জানমহম্মদ ভাঙা গলায় সমর্থন করল, 'গেটমে পাঁচ পাঁচ দশ দশ বাল্‌ব্ লাগা দিয়া—বহুৎ খরচা ভি হোগা...'

শিকের এপাশ থেকে বাইরেটা চোখে পড়ে না। অনেক কসরৎ করে শুধু আভাসটা চোখে পড়ে। সন্ধ্যের সঙ্গে সঙ্গে থানার গেটটা এবং সম্মুখটা আলো আর কাগজের মালায় উৎসবোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তারই আভাস। সেইটুকু দেখেই খুশী হয়ে উঠেছে কালাচাঁদ। যতটুকু দেখা যাচ্ছে, সেইটুকু দেখেই ও কল্পনা করে নিচ্ছে বাকিটুকু। আর ছেলেমানুষের মত উৎসাহিত হয়ে উঠেছে—'ওহ! লাল, নীল! দেখ্ দেখ্ এ্যাইসা করকে আঁখ রাখনেসে, উ দেখনে মিলেগা'…খুশির চোটে ও উপদেশ দেয় জানমহম্মদকে। বন্ধ শিকের কোন্ কোণে, কি কায়দা করে চোখ রাখলে বাইরে আলোর আভাটুকু দেখা যাবে তাই বোঝায়।

জানমহম্মদ মৃদু ভাঙা গলায় কি একটা দুর্বোধ্য বিকৃত সুর ভাঁজছিল আপন মনে। গান থামিয়ে বলে, 'বাইরে ভি বহুৎ সাজাবে। তামাম কলকাত্তায় আজ ফুর্তি হবে। গেট বানাবে, নিশান দিবে। বহুৎ খরচা ভি হবে ' তারপর, 'আচ্ছা বোলো, কেতনে রূপয়া খরচা হো শকতা ?'

'এক দো লাখ তো হোগা জরুর।'

'বাস ?'

কালাচাঁদ বিব্রতভাবে আরো সঠিকভাবে বলার চেষ্টা করে 'উস্‌সে জ্যায়দা ভি হো শকতা, কেতনে কেতনে আমীর লোগোঁ হ্যায়—'

'বাস্ ?' জানমহম্মদ হাঁ করে জিজ্ঞেস করে। যেন এইটুকু খরচে ও খুশী নয়।

কালাচাঁদ ওর অপ্রীতিকর দৃষ্টিটা থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে আবার বাইরে রংচঙা আলোর আভাটায় নজর দেবার চেষ্টা করে। কিন্তু চট করে মন বসাতে পারে না। বলে, 'শালা আজকের মত একটা দিন! কত সাজাবে আজকে, কত ফুর্তি করবে সবাই। আজকেই শালারা ধরে রাখলে আমায়…'

জানমহম্মদ মাথা ঝাঁকায়, "আজ বহুৎ খরচা করবে সরকার। সিপাহী লোগের ভি বহুৎ খানাপিনা হবে। জেলখানায় কয়েদী লোগ

লেকিন বহুৎ আচ্ছা লাগতা। লেকিন আদমীকো আচ্ছা নেহি লাগতা……'

এই সময় সিপাহীটা ফিরে আসে আবার। ঘটাং ঘটাং চাবির শব্দ করে দরজা খোলে অর্ধেকটা। তারপর উদারভাবে ডাকে—'আও বাহার আও! এক এক আদমী। বড়াবাবু হুকুম দে দিয়া! বোলা কি ও যো দোনো আসামী হ্যায়, উনকো দো দো মিনিট করকে বাহার ঘুমাকে দেখা দো রোশনাই! আজাদীকা দিন….'

হঠাৎ অপ্রত্যাশিত খুশিতে চোখ চক্‌চক্ করে ওঠে কালাচাঁদের! দু-মিনিট? হোক দু-মিনিট, তবু তো কিছুক্ষণের জন্য এই গহ্বরটা থেকে বাইরে নিয়ে গিয়ে দেখাবে। কলকাতা কেমন সেজে উঠেছে কি রকম খুশী হয়ে উঠেছে সবাই তা দেখতে পাবে! কালাচাঁদই প্রথম এগিয়ে যায়।

অন্ধকার হাজতের গহ্বর থেকে বেরিয়ে এসে হঠাৎ এই আলো-ঝলমল অপরিচিত কলকাতাকে দেখতে সত্যিই অপূর্ব লাগে। থানার গেট পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হল ওদের। সেখান থেকেই দেখা যায় প্রশস্ত রাজপথটার দু-ধারে শুধু রঙীন কাগজ আর আলোর সারি। এক একটা পতাকার দণ্ডের ওপর মণির মত এক একটি বিদ্যুৎ দীপ। থানাটাও সেজে উঠেছে এক মনোহারিণী বেশে। অজস্র কাগজের ঝালর আর কাগজের লণ্ঠনে ঝলমল করছে কঠিন সিমেন্টের প্রবেশ পথটা। এর মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে অমলকান্তি, ধুতি পাঞ্জাবি নয়, পুলিসী পোশাকে। তবু অদ্ভুত সুন্দর দেখাচ্ছে তাকে।

চারদিকার লাল নীল্ বাল্‌ব্ থেকে একটা মসৃণ স্বচ্ছ আলোর আভায় আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে অমলকান্তি। যেন মনে হয় সিনেমার কোন একটা দৃশ্য। কোন এক যাদুতে যেন এই কুৎসিত কলকাতা শহর আর তার মানুষগুলো পালটে গিয়েছে।

কয়েক মুহূর্ত মাত্র। তারপর আবার ফিরে আসে হাজতের গহ্বরে। কিন্তু ওরাও যেন অন্যরকম হয়ে উঠেছে। চোখ চকচক করছে কালাচাঁদের, 'মাইরী শালা যেন সিনেমার ছবি! আহ!' বলে

আপনমনে চোখ বুঁজে যেন দৃশ্যটাকে কল্পনায় আবার উপভোগ করে নেয়।

জানমহম্মদ আত্মগতভাবে জিজ্ঞেস করে, 'আচ্ছা, তুম তো কুছ লিখাপড়া আদমী আছো। তো সিনেমামে যেত্‌নে সব কুছ দেখাতা এইসা হো শকতা ? কেতনে খাপসুরৎ জেনানা·······কেতনে মোকান কেতনে চিজোঁ—এইসা হো শকতা ?'

কালাচাঁদ চোখ বুঁজে থাকে, 'মাইরী আমরাও ফুর্তি করব, কেনে করব না ?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ খুশিয়ালীকা দিন।' জানমহম্মদ অন্যমনস্কভাবে মাথা ঝাঁকায়। তারপর আচমকা বলে 'আচ্ছা হামারা নাম কেয়া হ্যায় বোল শকতা ? জানমহম্মদ ? নেহি চার-পাঁচ নাম হ্যায় হামারা। দেখো, এক জানমহম্মদ, দো নসীরাম, তিন বিহারী, চার কাল্লু, পাঁচ···· লেকিন কোই আদমিকো হাম নেহি পসন্দ করতা, কিসিকো সাথ হামারা দোস্তালী নেহি হোতা·······'

'ছোড় দো উবাত—' বলে কালাচাঁদ ওকে থামায় তারপর গান ধরে, খুশির আমোদের গান—

আঁখিয়া মিলাকে দীয়া ভরমাকে।
চলে নেহি যানা
এ-এ—এ-চলে নেহি যানা············

জানমহম্মদ চোখ বুঁজে শোনে। তারপর হঠাৎ ওকে থামায়—'আচ্ছা শুনো হামারা এক গানা। ম্যায় ভি গা শকতা।' বলে অদ্ভুত ভাঙা বিকৃত গলায় একটা একঘেয়ে স্বরের অস্পষ্ট গান শুরু করে। পরিচিত কোন গান নয়, হয়তো কোন গ্রাম্য দেহাতী গান। অনেকক্ষণ আগে সম্ভবত এই গানটাই গাইছিল জানমহম্মদ। গাইতে গাইতে জানমহম্মদের চোখে পড়ে কালাচাঁদ শুনছে না। হঠাৎ বিকৃত ভাঙা গলায় চিৎকার করে ওঠে ও—'এ্যাও।'

কালাচাঁদ চমকে তাকায় 'কেয়া হুয়া ?'

জানমহম্মদের বিরাট কুৎসিত চোখ দুটো আধা ঘৃণায় তীব্র হয়ে উঠেছে। হো হো করে ভাঙা গলায় খানিকটা হাসল—'কুছ নেহি! তোমহি একেলা গাও…'

কালাচাঁদ ভীতভাবে চুপ করে যায়। জানমহম্মদ দ্বিগুণ জোরে ধমক দেয়, 'কেয়া বোলা, গাও।' চোখ ছোট করে আপন মনে আবার ভয়ে ভয়ে গাইতে শুরু করে কালাচাঁদ 'এ-এ-এ—

চলে নেহি যানা….'

গান গায় আর মাথা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে হাততালি দেয়।

হঠাৎ গানের মধ্যে থেমে যায় কালাচাঁদ—'এ শালা! একিরে বাবা?'

গানের চোটে ফুর্তির চোটে ওরা এতক্ষণ খেয়াল করেনি থানার মধ্যে কি হচ্ছে। এখন খেয়াল করেও ঠিক বুঝতে পারল না কি ব্যাপার। শুধু বোঝা গেল, একটা হুলস্থূল লেগে গেছে। বড়বাবু মোটা ভুঁড়ির ওপর বেল্টটাকে টানাটানি করতে করতে হুকুম দিচ্ছেন। তাড়াহুড়া লেগে গেছে সিপাহীদের মধ্যে। কেউ পোশাক পরছে কেউ সাদা পোশাকেই রুল নিয়ে তৈরি হচ্ছে। টেবিলের ওপর ক্রীং ক্রীং করে আর্তনাদ করছে টেলিফোনটা। মেজবাবু নার্ভাস্ হয়ে ঘোরাঘুরি করছেন—'শালা ঝামেলা। যত ঝামেলা সব আমার ওপর…'

'কী হল?' কালাচাঁদ ফিসফিস করে।

জানমহম্মদ তার মোটা হাতের থাবড়া দিয়ে ধমক দেয় ওকে, 'চোপ! বহুৎ গোলমাল হুয়া।'

'কী গোলমাল?'

'কেয়া মালুম। গোলমাল হোগা জরুর।'

ফুর্তিটা এভাবে ভেঙে গেল দেখে মুসড়ে পড়ে কালাচাঁদ। বিষণ্ণভাবে হঠাৎ বকতে শুরু করে, 'পাড়ার কতগুলো ছোঁড়া বলছিল একি স্বাধীন হল? পেটে ভাত নাই, কী স্বাধীন! দূর শালা….'

জানমহম্মদ খুশী হয়ে উঠেছে। ভাঙা বিকৃত গলায় আবার সজোরে গান শুরু করেছে সে 'হাঁ, হাঁ, গোলমাল হোগা, বহুৎ গোলমাল। পিয়া নেহি যানা…'

গান আর কথা, দুটোই বলছে সুর করে। আর উল্লাসে চাঁটি মারছে মেজের ওপর। কালাচাঁদ খোঁচা দেয় জানমহম্মদকে 'শোনো, ঐযে—'

শোনা যাচ্ছে—মাইকে গুঞ্জিত উৎসবের কাংস্যকণ্ঠ ছাপিয়ে স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে দূরে একটা ঝোড়ো আওয়াজ—হল্লা। উৎসবের হল্লা না হাঙ্গামার হল্লা কে জানে। সারা থানাটা ফাঁকা হয়ে গেছে একেবারে। শুধু অমলকান্তি একলা পায়চারি করছে নিশ্চিন্তভাবে। টেলিফোন থেকে মেসেজ টুকে রাখছে—

'এ্যাঁ হাঁ, হাওড়ার দিক থেকে আর একটা মিছিল আসছিল ?···· কমিউনিস্ট ? দুটো ভ্যান এখান থেকে গেছে। এ্যারেস্ট ? লালবাজারে জায়গা নেই ? হাঁ হাঁ আমাদের হাজতে জায়গা আছে—আচ্ছা···'

জানমহম্মদ চোখ বড় বড় করে শোনে, 'শুনা ? বোলতা হ্যায় কমিউনিস্ট! গোলমাল হোগা, গোলমাল হোগা'—বলে এক অদ্ভুত বিকৃত খুশিতে মাথা ঝাঁকায় আর তালি মারে শানের ওপর।

'নাচো, নাচো ! খুশিয়ালীকা দিন, নাচো—'

বাইরের হল্লা শুনে চমকে উঠে কালাচাঁদ। বিমর্ষভাবে আপন মনে কি ভেবে বিড়বিড় করে গালাগালি দিতে শুরু করে ওর বাপকে—'তো তুমি বাপ হয়েছ, তো তুমি খেতে দিবে না! রোজগার কর বললেই অমনি কে করতে পারে সেটা বল! সেদিন কি আজকাল আছে ?···দুর শালা !····'

হঠাৎ গান থামাল জানমহম্মদ। নির্জন থানাটা আবার সচকিত হয়ে উঠেছে জিপের শব্দে, সিপাহীদের বুটের শব্দে, জমাদারদের কর্কশ হুকুমে। 'বাপরে বাপ।' আপসোসের শব্দ করে চমকে উঠল কালাচাঁদ।

একদল নতুন আসামীকে ধরে নিয়ে এসেছে পুলিস। এলোমেলো ছেঁড়াখোঁড়া কাপড় জামা। ছেলে বুড়ো যুবক। ভদ্রলোক ছোটলোক সব রকমই আছে। দেখে মনে হয় হঠাৎ রাস্তা থেকে ধরে নিয়ে আসা হয়েছে যাকে পেয়েছে তাকে। প্রত্যেকেই এই রকম বিপর্যস্ত। কয়েকজনের গায়ে আর জামায় রক্তের দাগ দগদগ করছে। ঠাসাঠাসি

করে একই দলে দাঁড়িয়েছে সবাই, কিন্তু সম্ভবত কেউ কাউকে চেনে না, কেউ কারো সঙ্গে কথা বলছে না।

আঃ হা-হা—কালাচাঁদ ভীতভাবে আর্তনাদ করে উঠল ওরই মধ্যে একটা বাচ্চা হাফপ্যান্ট পরা বছর দশেকের ছেলেকে দেখে। ছেলেটা দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। ময়লা হাফ শার্টের সামনেটা রক্তে ভেসে গেছে। এক হাত দিয়ে ডান দিকের চোখটা চেপে ধরে আছে ও। হাতের ফাঁক দিয়ে এখনো ধীরে ধীরে রক্ত চুঁইয়ে পড়ছে।

মেজোবাবু এসেছিলেন এই দলটাকে নিয়ে। ক্লান্তভাবে বসে পড়লেন চেয়ারে। 'আমি আর পারছি না অমল, তুমি একটু দেখো—চোর ডাকাত হলে হয় কিন্তু এ··· ও তুমি, যা পারো করো। যত সব ঝামেলা।'

মেজোবাবু ক্লান্তভাবে চেয়ারে বসে থাকে একটা ভীত বিব্রত দৃষ্টি মেলে। হাজতে ঢোকাবার জন্য সেপাইগুলো গুনতি আর তল্লাশী শুরু করে আসামীদের। অকারণে ধাক্কা দেয় অকারণে গালাগালি দিয়ে গায়ের ঝাল মেটায়। ধৃত লোকগুলো নিশ্চল পাথরের মত দাঁড়িয়ে থাকে। একজন যখন মার খায় আর একজন তখন স্থিরভাবে তাকিয়ে থাকে। একটা প্রচণ্ড ঝড়ের পর এখন যেন নিঃশেষে খরচ হয়ে গেছে সবাই, চূড়ান্ত রকম ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। অমল উঠে এল ওদের কাছে। নির্যাতনের কাজটা সিপাহী পুলিসগুলোই সারছে। অমল শান্তভাবে সিগারেট ধরিয়ে ইশারা করে, কি করতে হবে।

গালাগালি খাচ্ছে, ধাক্কা খাচ্ছে। মার খাচ্ছে সবাই চোখের সামনে। প্রতিবাদ করবে, করা সম্ভব এ কথা কেউ ভাবেনি। হঠাৎ যেন রক্তের মূর্ছা থেকে মাথা ঝাঁকিয়ে উঠল ছেলেটা। রক্ত মাখা হাতটা দিয়েই একটা মুঠি পাকিয়ে চিৎকার করে উঠল তীব্র ভাঙ্গা গলায় 'মারো মারো দেখি কত সাহস। প্রতিশোধ পাবে একদিন। একদিন শোধ তুলব জেনে রেখো।'

এক মুহূর্তের জন্য ভেসে উঠল ছেলেটার রক্তস্রোতে অন্ধ ভয়াবহ আহত চোখটা। এক মুহূর্তের জন্য আসামীর ভিড়ের মধ্যে ঝলকে

উঠল রক্তমাখা কচি হাতটা—ময়লা শার্টটা। এক মুহূর্তের জন্য যেন উৎসবের লাল আলোর আভা ঘনীভূত হয়ে উঠল এই আহত বালকটার ওপর। তারপর আর তাকে দেখা গেল না। মুখ খিস্তি করে এগিয়ে এল অমল। 'শালা কমিউনিস্টের তেজ দেখো। তেজ বার করছি তোমার…'

সমস্ত থানাটা কয়েক মুহূর্তে নিশ্বাস বন্ধ করে স্তব্ধ হয়ে যায়। হঠাৎ দূর থেকে শোনা যায় মৃদু বিকৃত গলার একটা আওয়াজ—'বাহাদুর!' আসামীরা চমকে উঠে চোখ ঘোরায়। হাজতের শিকে মুখ রেখে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছে জানমহম্মদ। "আঃ বাহাদুর!" জানমহম্মদ অস্পষ্টভাবে বলে। তারপর শিকের ভেতর থেকেই সরাসরি গালাগালি দিতে শুরু করে অমলকান্তির উদ্দেশে—'শালা খানকীর বেটা, শালা গায়ের জোর দেখাচ্ছে….'

হট্টগোলের মধ্যে অমলকান্তি সে কথা শুনতে পেয়েছে কিনা বোঝা গেল না।

সবকটা আসামীকে ঠেসে পোরা হয়েছে সংকীর্ণ হাজতটার মধ্যে।

জড়াজড়ি ঠাসাঠাসি করে বসেছে সবাই। অস্ফুট স্বরে দু-একজন দু-একটা কথা বলে আবার চুপ করে থাকে।

এঃ একি?

কম্বল।

এতেই শুয়ে থাকতে হবে?

হ্যাঁ।

বাইরে রেডিওর গানগুলো থেমে গেছে বোধ হয়। শুধু ঝোড়ো একটা আওয়াজ এসে মাঝে মাঝে আছড়ে পড়ে ভেতরে। এরই মধ্যে কে একজন মাঝে মাঝে ফোঁপায়। জানমহম্মদ পাশের লোকটাকে ভাঙা গলায় জিজ্ঞেস করে, 'কী হয়েছিল?'

'কে জানে। হাঙ্গামা হয়েছে। মিছিল করেছিল….আমরা রাস্তার লোক আমাদের ধরে নিয়ে এসেছে। আমরা কি জানি….'

'মেরেছে ?'

'ভীষণ মেরেছে—শালা!' যে উত্তর দিচ্ছিল সে এতক্ষণ জানমহম্মদের দিকে তাকায়নি। অস্পষ্ট অন্ধকারে হঠাৎ তাকিয়ে ওর অপ্রীতিকর কুৎসিত মুখটা দেখে চুপ করে যায়। কি জানি কেন আর কথা বলে না।

একজন কোথা থেকে বলে ওঠে, 'এই চোর ডাকাতদের সঙ্গে থাকতে হবে···'

যে লোকটা ফোঁপাচ্ছিল হঠাৎ তার গলার স্বর শোনা যায়—'এ শালা কমিউনিস্টদের কাজ! আমি জানি, আমার পোড়ারমুখী বোনটা ওই দলে গিয়ে ভিড়েছে। ও মাগো····আমি কোনদিন বাড়ি ছেড়ে থাকিনি।

এখানে আমি থাকতে পারব না···ও দারোগাবাবু আপনার দুটি পায়ে পড়ি···'

হঠাৎ ভেউ ভেউ করে কাঁদতে শুরু করেছে লোকটা।

'কোন হ্যায় রে ?' জানমহম্মদ ভাঙা গলায় জিজ্ঞেস করে।

তারপর সরে যায় লোকটার দিকে। বছর বাইশ বছরের একটা ছেলে। আদুরে চেহারা। একটা হাফশার্ট গায়ে। দু-চোখ দিয়ে তার অঝোরে জল পড়ছে!

'রোতা কেঁউ ?'

ছেলেটা কোন উত্তর দেয় না। আপন মনেই বিলাপ করে চলে—'ও দারোগাবাবু আপনার দুটি পায়ে পড়ি···'

জানমহম্মদ হঠাৎ কি ভেবে প্রচণ্ড এক চড় কষে ছেলেটার আদুরে মুখটার ওপর—'ভদ্দরলোকের ছেলে, তো ক্যানে গিয়েছিলে বাবা? ক্যানে এসবের মধ্যে মজা দেখতে গিয়েছিলে ?'

ছেলেটা হতভম্বের মত কোঁৎ করে একটা ঢোঁক গিলে চুপ করে যায়। চুপ করার কারণ জানমহম্মদের চেহারা, না চড়টা, বোঝা যায় না। বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকে জানমহম্মদের মুখের দিকে।

'হো হো হো হো—হাউ…' জানমহম্মদ ভয়ংকর খুশিতে ভাঙা গলায় হাসল একটু। সমস্ত হাজতটা এক মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে যায়। ফিস্ ফিস্ করে একজন জিজ্ঞেস করে—'কে ?'

আর একজন ভীতভাবে উত্তর দেয়—'সেই চোরটা বোধ হয়……'

জানমহম্মদ এই দলটার মধ্যে খুঁজে বেড়ায় সেই আহত দশ বছরের ছেলেটাকে।—'উ কাঁহা ?'

যাকে জিজ্ঞেস করে, সে অনিচ্ছার সঙ্গে কথা বলে। আঙুল দিয়ে একটা কোণ দেখিয়ে দেয়।

ছেলেটা ক্লান্ত হয়ে নেতিয়ে পড়েছে দেওয়ালে। রক্ত চোয়ানোটা কমে এসেছে এখন। মাথার এক গোছা চুল কপালের পাশে জমাট রক্তের মধ্যে এঁটে রয়েছে। হাত দিয়ে ঢেকে রেখেছে চোখটা। আহত দিকটা ক্রমেই ফুলে উঠছে থমথম করে।

'কী হয়েছিল ?'

পাশের লোকটা জানায় 'রুলের গুঁতো দিয়ে চোখটা শেষ করে ফেলেছে।'

'কার ছেলে ?'

'কে জানে,—কেউ চেনে না—'

চোখ বুজে মূর্ছার মত পড়ে আছে ছেলেটা।

জানমহম্মদ গলার স্বরটা যথাসম্ভব মোলায়েম করে মিনতির সুরে বলে—'কিছু হবে না, আরাম হয়ে যাবে। আমরা চোর আছি বাবু, কিন্তু একটা দাবা বলছি খুব ফল হবে।……বলছি কি আপনা মুসে থুক লেকে উ জখমকা উপর লাগা দেনা। সাচ্ বাত বাবু, আরাম হো যায়েগা।'

ছেলেটার পাশে যে লোকটা জানমহম্মদের সঙ্গে কথা কইছিল, সম্ভবত এ ধরনের ওষুধ ওর পছন্দ হল না, চুপ করে রইল। জানমহম্মদ অপ্রতিভভাবে সরে আসে। একটা পোড়া বিড়ি ট্যাঁক থেকে বার করে বলে, 'কিন্তু আমরা পরীক্ষা করে দেখেছি বাবু, আরাম হয়ে যেত, হ্যাঁ সাচ্ বাত……'

তারপর সরে আসে গেটের কাছে। মৃদু গলায় মিনতি করতে থাকে সিপাহীটার কাছে—'এ সিপাহীজী, উ বাচ্চা মর যায়ে গা। থোড়া দুধ পিলা দেনা····এ সিপাহীজী···'

হঠাৎ ঘটাং করে হাজতের দরজা খুলে যায়। দুটো সিপাহী ঢুকে খুঁজতে থাকে আঙুল নেড়ে— 'কাঁহা গিয়া উ শালা ? কাঁহারে—এই শালা ; ইধার আও—'

কাকে ডাকছে প্রথমটা বোঝা যায় না। পরে বোঝা যায় জানমহম্মদই ওদের লক্ষ্য। জানমহম্মদকে চোখে পড়া মাত্র ক্যাঁক করে থাবা দিয়ে ধরল ওর গর্দান। তারপর টানতে টানতে নিয়ে গেল বাইরে।

বাইরে পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে আছে স্যুটপরা অমলকান্তি। বাইরের গেটের লাল নীল আলোটা তির্যকভাবে এসে পড়েছে ওর মুখের ওপর। হঠাৎ ওর তীক্ষ্ণভাবে শানিত মোচের পাশে মুখের একটা ভাঁজ কেমন নিষ্ঠুর আর কুৎসিত বলে মনে হয। অমলের একদিককার ঠোঁট একটু ফাঁক হয়ে যায় এক অস্বাভাবিক হাসিতে—

'হ্যাঁ, হ্যাঁ এই শালা—তখন থেকে শালা গালাগালি দিয়ে যাচ্ছে !··· সেই দিনের বেলা থেকে। ভেবেছে আমি শুনিনি···দাও দাও শালাকে আচ্ছা করে—'

সোনা বাঁধানো দাঁতওলা সেপাহীটা এসে দাঁড়িয়েছে এক আজ্ঞাবহ নেকড়ের মত। দড়াম করে লাথি দিয়ে উল্টে ফেলা হল জানমহম্মকে। ধাক্কার তোড়ে ছিটকে পড়ল কয়েকটা চেয়ার। তারপর চলল এলোপাথাড়ি লাথি আর ঘুষি। বিকট চিৎকার করতে লাগল জানমহম্মদ। হয়তো যত লাগছে তার চেয়েও বেশি।

ভূতলশায়ী জানমহম্মদের পাশে দুই পা ফাঁক করে মৃদু হাসি নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল অমলকান্তি। 'শালার তেল বার করে ছাড়ব···'

গাঁ গাঁ করে চিৎকার করে চলল জানমহম্মদ। তারপর সেপাহী-গুলোই ক্লান্ত হয়ে মার থামাল। ঝাঁকি দিয়ে ওকে দাঁড় করাল দু-পায়ের ওপর। 'মাফি মাং হুজুরের কাছে—'

'বাবু!'

ফোলা ফোলা কুৎসিত বীভৎস মুখটা তুলে জানমহম্মদ তাকাল অমলকান্তির দিকে। মোটা ঘাড়ের ওপর কদর্য ন্যাড়া মাথা আর সাদাটে বিকট চোখ দুটো ঝিলিক দিয়ে উঠল এক অপরাজিত স্পর্ধায়।

'বাবু!'

বিদ্যুৎ স্পৃষ্টের মত মাথা ঝাঁকি দিয়ে উঠল অমলকান্তি। মুখের হাসিটা মিলিয়ে গিয়ে চিৎকার করে উঠল বিকৃত গলায়—'না, না, ছেড়ো না ওটাকে, শালার তেল মরেনি এখনো...'

প্রায় ঘণ্টা দুয়েক পরে চলৎশক্তিহীন জানমহম্মদকে এক সময় টানতে টানতে আবার এনে পোরা হল হাজতে। সমস্ত হাজত স্তব্ধ হযে গেছে দৃশ্যটা দেখে। ভয়ে ভয়ে এগিয়ে এল কালাচাঁদ—'ইস্!'

জানমহম্মদ নড়তে পারে না। তবু বেঁচে আছে ওর অশ্রুহীন বিকট চোখ দুটো। সে চোখ দুটো কেঁপে উঠল চিরকালকার অপরাজিত অভ্যস্ত স্পর্ধায। তারপর মুখ বিকৃত করে মৃদু গলায হেসে উঠল—'হা হা হা হোউ.......শালারা পারলে না। শেষ পর্যন্ত ছেড়ে দিলে......'

স্তব্ধ হাজতটায আর কেউ কোন কথা জিজ্ঞেস করলে না। দূরে ঝোড়ো কোলাহল একটা শোনা যাচ্ছে এখনো। তারই সাথে মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে দু-একটা তীব্র চকিত আওয়াজ। উৎসবের বাজি ফাটাবার শব্দ না গুলির শব্দ কে জানে।

জানমহম্মদ ছেঁচড়াতে ছেঁচড়াতে সরে এল ছেলেটার কাছে। —'কেমন আছ? কুছ আরাম হযেছে?'

ছেলেটা তন্দ্রা থেকে এই প্রথম জেগে উঠল জানমহম্মদের কথায়। আহত চোখটা চেপে ধরেই তাকাল অন্য চোখটা দিয়ে। সম্ভবত এই প্রথম ও দেখল জানমহম্মদকে। তারপর হঠাৎ আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল—'আঁ আঁ! কে ওটা, এটা কি? এটা কি?'

জানমহম্মদ ভাবতে পারেনি ওর চেহারা দেখে ছেলেটা অমন ঘৃণাভরে চিৎকার করে উঠবে। এক মুহূর্তের জন্য থমকে রইল ও

তারপর বড় বড় চোখ ছুটো ওর জ্বলে উঠল স্পর্ধায়। হো হো করে হেসে ওঠার আগে মুখের মাংসপেশীগুলো যেমনভাবে কেঁপে উঠে তেমনি ভাবে উঠল মুখটা।

কিন্তু হেসে উঠতে পারল না। পরাজিতের মত মাথাটা নত করলে, কি ভেবে বিড় বিড় করে বললে—'আমি চোর আছি বাবু। উ লেড়কা আচ্ছা লেড়কা আছে বাবু। লেকিন—বাচ্চা আমার চেহারা দেখে ভয় পেয়ে গেল। সবাই চেহারা দেখে ডর পায় বাবু। আমার দোস্ত কেউ না আছে বাবু! উ লেড়কা…' তারপর ছেঁচড়াতে ছেঁচড়াতে সরে গেল একটা কোণের দিকে। ছুই হাঁটুর মধ্যে মাথা নীচু করে বসে রইল নিশ্চুপ হয়ে।

বাইরে তখনো তোলপাড় করছে ঝোড়ো আওয়াজটা। স্তব্ধ হাজতের মধ্যে শুধু শোনা যাচ্ছে কালাচাঁদের বিষণ্ণ বিড়বিড় বিলাপ —'পাড়ার কতক ছোঁড়া বলেছিল, কী স্বাধীন হল, ভাত নাই কাপড় নাই, কী স্বাধীন!'

বিজ্ঞাপন

নতুন পাশ করার পরেই চাকরি পেয়ে গেলাম একটা চা বাগানে। পরিচিত লোকেরা বললেন ভালো হয়েচে। মাইনে যাই হোক, রোজগার হবে।

রোজগার না হোক, বেশ লাগল জায়গাটা। এতদিন ছাত্র ছিলাম, অন্যের কর্তৃত্বে চলে চসেছি। এখন হঠাৎ একটা ডিস্‌পেনসারী, একটা কোয়ার্টার আর চিকিৎসা করার জন্য হাজার দেড়েক কুলী পেয়ে গিয়ে খানিকটা খুশী না হয়ে পারিনি। কিছুটা অস্বস্তিও হত অবশ্যি। আমার চেয়ে বয়সে অনেক বড়ো এমন অসুস্থ লোকেরা নিশ্চিন্তে আত্মসমর্পণ করছে একমাত্র আমার কাছে—দেখে অবাক লাগত মাঝে মাঝে!

বেশ সাজানো ডিস্‌পেনসারী। দুই আলমারী ওষুধ। চেয়ার টেবিল যন্ত্রপাতি। উঁচু করে সিমেণ্ট বাঁধানো ভিতের ওপর শাদা রঙকরা কাঠের বাড়ি। লাল রঙা টিনের চাল।

বারান্দায় ইজি চেয়ারটা টেনে আনলে দেখা যেত একরের পর একর চৌখুপী ঘন সবুজ গালিচার মত পাতা আছে চায়ের বাগান। তার মাঝে মাঝে ধীরে ধীরে ইতস্তত নড়ছে কয়েকটা কালো কালো মূর্তি। কাজ করছে কুলীরা।

আর দেখা যেত পাহাড়। কুয়াশায় হারিয়ে যেত মাঝে মাঝে। কুয়াশা পাতলা হয়ে গেলে মাঝে মাঝে সুস্পষ্ট নজরে পড়ত আকাশের গায়ে ছেঁড়াখোড়া পাতলা কাগজের এক মানচিত্রের মত। যেদিন

কুয়াশা কেটে যেত সেদিন সকালে হঠাৎ আশ্চর্য হয়ে আবিষ্কার করতাম এক রাত্রের মধ্যে কোথা থেকে ঘরের দুয়ারে এসে দাঁড়িয়েছে এক জীবন্ত নীল ঐরাবত।

আমাদের বাগানের ম্যানেজার বাঙালী। আর সবই সায়েব বাগান। ইউরোপীয়ান ক্লাব আছে মাইল তিনেক পাহাড়ে পথের পরে। সেখানে শনিবার রাত্রে আমাদের ম্যানেজার নিমন্ত্রণ পান কখনও কখনও। সারারাত হুল্লোড় করে সকালে দুপুরে ফিরে আসতেন একটু মত্ত অবস্থায়। ইংরেজীতে বলতেন—এদিকে সায়েবগুলো খাতির জমাচ্ছে বাঙালীদের সঙ্গে। ব্যবসা বোঝে কুকুরের বাচ্চারা।

আমি আসার কয়েকদিন বাদে।

অমনি ঈষৎ মত্ত অবস্থায় ম্যানেজারবাবু আমার ডাক্তারখানায় এলেন। পিঠ চাপড়ে জিজ্ঞেস করলেন—'কিরকম লাগছে হে ছোক্‌রা—?'

বললাম—'বেশ লাগছে। খুব ভালো জায়গা। তবে ম্যালেরিয়া বড্ডো বেশি। এত ম্যালেরিয়ার রুগী নিয়ে কি করব বুঝে উঠতে পারছি না।'

'হাঁ এখানেতো ঐ একটা রোগই ম্যালেরিয়া। তবে নজর রাখবেন একটু—নতুন লোক! কুলীগুলো মিছিমিছি এসে বলবে, কাঁপুনি দিয়ে জ্বর এসেছিল এখন ছেড়ে গেছে। তারপর ঐ ছুতোয় কাজে যাবে না। এদিকে রেশনের সময় রেশন না পেলে ঝগড়া করবে।'

কুলীরা যদি কাজে না যায় তাহলে তাদের রেশন কেটে রাখা হয়—এই নিয়ম। অবিশ্যি যদি মেডিকেল সার্টিফিকেট দিতে পারে তাহলে অর্ধেক রেশন পায় কখনো কখনো। বললাম—'নজর রাখব। কিন্তু কুইনাইনের স্টক একদম নেই যে। বড়োবাবুকে দিয়েছিলাম অর্ডার লিখে, তিনি গা করছেন না।'

ম্যানেজার চমকে উঠলেন—'কুইনাইন! তুমি কি কুইনাইন দিচ্ছো নাকি ওদের? এখানকার ম্যালেরিয়া কিচ্ছু হবে না কুইনাইনে, অন্যান্য কিছু রঙচঙে ওষুধ যা পারো করে দিও।'

আমি চুপ করে রইলাম।

ম্যানেজার আপন মনে হাসলেন কিছুক্ষণ, তারপর বললেন—'ঐ সায়েবগুলো, জানো? আমি তখন সায়েব বাগানেই কাজ করতাম। ডিবিসনের ডাক্তার এলেন একজন খাস বিলাত থেকে। পাশকরা বাঙালী যারা ছিলেন তাদের সবার উপরে কর্তা। পরে কি বেরুল জানো—বেটা ঠক। বিলেতে কোন এক ড্রাগিস্ট শপে কম্পাউণ্ডার ছিল। অথচ বছরের পর বছর এখনকার পাশকরা বাঙালী ডাক্তারদের ওপর কর্তৃত্ব চালিয়ে এসেছে। ভয়ে কেঁচো হয়ে থাকত সবাই। কত লোককে যে অচিকিৎসায় মেরেছে শালা—মামলা করেছিল বাঙালী ডাক্তাররা—চাপা দিয়ে দিলে'—ম্যানেজার হো হো করে হাসতে লাগলেন। বললেন 'আর তুমি বিনা কুইনাইনে চিকিৎসা চালাতে পারবে না?'

হাসির চোটে কথা আটকে আটকে আসছিল ম্যানেজারের। ভালো লাগেনি আমার। কখনও আপনি বলছে কখনও তুমি বলে ডাকছে আমাকে—এরকম ব্যবহারে মনটা প্রসন্ন হয়ে ওঠার কথা নয়।

কুইনাইন না থাকলেও সোৎসাহে চিকিৎসা চালিয়ে যেতে লাগলাম। ম্যানেজার যা বলছিলেন, ব্যাপারটা অনেকটা তাই। দলে দলে কুলী আসে। সূতী চাদর গায়ে জড়িয়ে সারি সারি উঁচু হয়ে বসে থাকে সিমেন্টের বারান্দার ওপর। কেউ শুয়ে পড়ে সটান। মেয়ে কুলীগুলো একটু ভীতু। ডাক্তারখানার বারান্দায় গিয়ে উঠে জায়গা করে নিতে সাহস পায় না। একটু দূরে মাটির ওপর ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে।

হাত বাড়িয়ে দেয় সবাই—খংচটা লোহার প্ল্যাটের মত চেপ্টা শীর্ণ কব্জি। বোঝা যায় লোহার মতই একটা দুরন্ত প্রতিরোধ ক্ষমতা হয়ত আছে ওদের দেহে। এত ম্যালেরিয়ায় ভোগে তবু চট করে মরতে চায় না কেউ। রোগা হয়ে শুকিয়ে গিয়ে তবু টিকে থাকে কেমন করে।

কাড়াকাড়ি করে সবাই। বুকে ষ্টেথেস্কোপ দিয়ে পরীক্ষা না করলে ছাড়ে না। মনে করে বুঝি ডাক্তার ফাঁকি দিচ্ছে।

কিন্তু ঐ পর্যন্তই। অসুখ পরীক্ষা করাবার জন্যে যতখানি আগ্রহ, ওষুধ নেবার জন্যে তেমন আগ্রহ দেখা যায় না কারো। পুরিয়া করে দেয় কম্পাউণ্ডার, রঙীন ওষুধ ভরে দেয় শিশিতে—কিন্তু কেউ খুশী হয় না। ওষুধ নিয়েও বসে থাকে।

ধমক দিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম—'বসে আছিস কেন?'

'লিখে দিবি না? অসুখটা হল লিখে দিবি না তুই?'

'কেন ওষুধ তো দেওয়া হল—এবার ভালো হয়ে যাবে।'

সন্দিগ্ধভাবে মাথা ঝাঁকাল লোকগুলো—'ভালো হবে বলছিস্? কিন্তু কাগজটায় লিখে দে তবে—'।

কম্পাউণ্ডার জানত। ওষুধ তৈরির ঘর থেকে বেরিয়ে এসে অশ্লীল গালাগালি দিল খানিক। এক ফাঁকে বললে, 'আপনি ভাবছেন ঐ ওষুধ শালারা খাবে? বাড়ি গিয়ে ফেলে দেয় সব। যতই রঙীন ওষুধ দিন—ওরা জানে যে কুইনাইন দেওয়া হয়নি। আসল মতলব মেডিকেল সার্টিফিকেট চাই—'

কম্পাউণ্ডার গাল দিয়ে, রাগের ভঙ্গি করে তাড়িয়ে দিল সবাইকে। দু একটা লাথিও দিতে হয়েছিল বোধ হয়।

গজ গজ করতে করতে সবাই শেষ পর্যন্ত চলে গেল, কিন্তু বারান্দার ওপর তখনও বেঘোরে পড়েছিল একটা লোক। কম্পাউণ্ডার লাথি মারতে শুরু করলে। আমি বাধা দিয়ে বললাম—'আহা অসুস্থ লোকটা'—

'ও অসুখে কিছু হয় না ওদের। দেখুন না ব্যাটা হাঁড়িয়া গিলে পড়ে আছে—'

হাঁড়িয়া গিলেছে সত্যি। হাঁ-করা মুখ দিয়ে ভর ভর করে দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে। কিন্তু অসুখ হয়েছে এটাও সত্যি কথা। অন্তত ১০৪ ডিগ্রি জ্বর। লাথি খেয়ে থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে লোকটা উঠে বসল। বললে—'লাথি মারছিস কেন? হাঁড়িয়া না খেলে বেমার সারবে? তোর ওষুধে কি আছে? কিছুই নাই—'

কম্পাউণ্ডারকে বললাম, 'যা টুক আছে তা থেকেই একে একটা কুইনাইন মিক্শ্চার করে দাও।'

জিজ্ঞেস করলাম 'তোর নাম কি ?'

বললে—'সোমরা ওরাঁও।'

আঙুল দিয়ে কুলী লাইনের দিকে কি দেখাল আর জড়িত-ভাবে কি বললে বুঝলাম না। আন্দাজে মনে করে রাখলাম জায়গাটা।

'এতটা পথ হেঁটে এলি কেন ? বাড়ি গিয়ে শুয়ে থাকগে যা।'

ইজি চেয়ারে বসে বসে দেখলাম টলতে টলতে হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে হেঁটে যাচ্ছে সোমরা। হাজার হলেও লোকটা জোয়ান। কালো পেছনটা দেখা যাচ্ছিল—স্তূপ স্তূপ পেশীর ভারে কেমন কুঁজো হয়ে বেঁকে গেছে চওড়া পিঠ।

কেমন নেশার মত লাগছিল জায়গাটা। ওখানকার মানুষ, ওখানকার মাটি, পাহাড়ে ঝোরা আর শালবনের জঙ্গলে একটা আশ্চর্য কুহক টেনে রাখে মনকে।

আলাদা একটা রাজ্য। জীবনযাত্রার নিয়ম একেবারে পৃথক।

নতুন ডাক্তার এসেছে শুনে সার্টিফিকেটের জন্য প্রথম প্রথম ডিউটিরত কুলীরা আসতো। সার্টিফিকেট দিই না দেখে ক্রমশ কমে গেল রোগীর সংখ্যা। অবসর সময়ে ঘুরে বেড়াতাম এখানে ওখানে। চায়ের বাগানগুলোর দৌলতে লম্বা লম্বা পীচের পথ আছে এ বাগান থেকে ও বাগানে। রেল লাইন আছে সাঁকো আছে পাহাড়ে ঝোরার ওপর। চারিদিককার বন্য আবহাওয়ার মধ্যে মাঝে মাঝে বেমানান লাগে সভ্যতার এই সব স্থবিধা।

কিন্তু শুধু ঐ টুকুই।

বেড়াতে বেড়াতে এগিয়ে যাচ্ছিলাম লাইন ধরে। কয়েকজন গ্যাংমেন কাজ করছিল লাইনের ওপর। পেছন থেকে ডাকল—

'ওদিকে যাবি তুই একলা ?'

'কেন ?'

'হাতী বেরিয়েছিল কাল রাতে। আমাদের পুলটা ভেঙ্গে দিয়েছে শুঁড়ে করে—,

পাহাড় থেকে সার বেঁধে বেতের টুকরী মাথায় বেঁধে নেমে আসে জংলা জংলা লোকগুলো। কোমরে এক একটা ভোজালী।

'কোথায় যাচ্ছে ওরা' ?

লোকে বলে, 'ভুটান চলে যাচ্ছে। ছ মাস কাজ করল জঙ্গলে এখন বাড়ি যাচ্ছে। আবার আসবে—'

সভ্য জগত থেকে একেবারে হারিয়ে যাইনি তা মনে পড়ে দৈনিক ডাক পেয়ে। বাগান গুলোর দৌলতে জংলা পথ পাড়ি দিয়ে বল্লমে বাঁধা ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে নিয়মিত আসে ডাকহরকরা। চিঠি আনে আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকে—তিন চার দিনের খবরের কাগজ একসঙ্গে করে নিয়ে আসে মাঝে মাঝে।

'লাইনে দুটো কুলী মারা গেছে ডাক্তারবাবু'—কম্পাউণ্ডার জানাল।

আশঙ্কিত হ'য়ে জিজ্ঞেস করলাম—'কিসে ?'

'ঐ ম্যালেরিয়ায়। ও বেটারা ওষুধ নিতেও আসেনি এখানে। কুলী লাইনে ওরা মুরগী বলি দিয়ে ওদের দেবতার পূজো করছে।'

'কেন ?'

'আপনি জানেন না এখনও। রোগে মরেছে—সে কথা ওদের মাথায় ঢুকলে তো ! ওরা ভাবছে ভূতপ্রেতের রাগ হয়েছে ওদের ওপর তাই লোক মরছে।'

কম্পাউণ্ডার হাসল কিছুক্ষণ ধরে।

'পূজো দিয়ে মাঝে মাঝে ওদের রোগ সেরেও যায়—কিন্তু—'

কষ্ট হয়নি, খানিকটা অবাক হয়েছিলাম শুধু। সভ্যতার যতটুকু সুবিধাও এসেছে এখানে তা কাগজে কলমে। এখানকার জঙ্গলে এখানকার পাহাড়ে ওসবের প্রয়োজন নেই। আবাদের শুরু থেকে এখানে যে আদিম জীবন যাত্রা চলেছে তার অন্ধকারে অকিঞ্চিতকর মনে হয় সাজানো আলমারিগুলো।

জিজ্ঞেস করলাম—'তাহলে এ ডিসপেন্সারীর ঠাঠ কেন, তুলে দিলেই হয়।'

কম্পাউণ্ডার আবার হাসল—'বাঃ, বাগানের বাবুদের চিকিৎসা করতে হবে না! তাছাড়া আইন আছে—বাগানে ডাক্তার ডিসপেন্সারী রাখতে হবে—'

কিন্তু শোনা গেল এই আদিম দুর্বোধ্য জগতেও নাকি তোলপাড় শুরু হয়েছে।

ম্যানেজার আর একদিন এলেন। আজকে হুইস্কি টেনে আসেন নি। এমনি এসেছেন। কথায় কথায় বললেন, 'একটু সাবধানে থাকবেন। কুলী লাইনের ওদিকে বেশি যাবেন না। বেটারা বুনো জাত—কখন ক্ষেপে ওঠে ঠিক নেই—'

ব্যাপারটা শুনছিলাম কয়েকদিন থেকেই। কুলীদের রেশন কমিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ম্যানেজার বললেন—'তাতে কিছুই নয়—কিন্তু শুনছি কোন এক দেবব্রত না কে ঘুরছে এদিকটায়। চুরি করে করে বাগানে টাগানেও ঢুকছে। ইস্তাহার ফিস্তাহার বিলি করছে বলে শুনছি—'

'আমাদের বাগানেও এসেছিল নাকি?'

'না আমাদের এ ডিবিসনেই বোধ হয় আসতে পারেনি এখনও। একেবারে বাঘের খপ্পর—সায়েবগুলো সেদিকে সেয়ানা আছে—। এখানে ট্যাঁ ফোঁ চলবে না।'

অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। একটা লোক দেবব্রত কোথা থেকে এসেছে। ছাপা ইস্তাহার বিলি করেছে বুঝি দু একটা এই অশিক্ষিত আদিম লোকগুলোর মাঝখানে; তাও এ বাগানে নয়। তাতেই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছেন ম্যানেজার।

যাওয়ার সময় ম্যানেজার বললেন—'কুইনাইনের স্টক তো নেই বলছিলেন আপনি?'

বললাম, 'যা ছিল বাবুদের দিতেই ফুরিয়ে গেছে সব।'

'আপনার অর্ডারটা পাশ করে দিয়েছি। বাগানের লাইসেন্স আছে, শীগগীরই প্রচুর কুইনাইন এসে যাবে। আপনি যা চেয়েছেন তার অনেক বেশি—'

কুইনাইনের জন্যে আর তেমন চাড় ছিল না আমার। নিজে দৈনিক পাঁচ গ্রেন করে খেতে পারলেই ভাগ্যবান মনে করতাম। যা ম্যালেরিয়া এখানে।

হাজার হলেও ডাক্তার। কুলী লাইনে দুটো লোক মারা গেল শুনে মনে বিঁধছিল। ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে উঠলাম কুলী লাইনে।

নোংরা সরু গলির দু'পাশে সারি সারি ছনের ঘর। মুরগী চরে বেড়াচ্ছে চারিদিকে। সোমরার নামটা মনে ছিল—জিজ্ঞেস করলাম—'সোমরার ঘর কোনটা?'

ঢেঁকিতে পাড় দিচ্ছিল কয়েকটা মেয়ে। আমাকে দেখে হাঁ করে চেয়ে রইল। কয়েকটা ছেলে ফিস্ ফিস্ করতে লাগল—'ডাক্তার বাবু!'

কম্পাউণ্ডার বললে—'শালীরা ভেবেছে মুরগী কেড়ে নিয়ে যেতে এসেছি। তাই কথা বলছে না।' সোমরার ঘর কোথায়? ধমক দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম। এক সঙ্গে সুর করে বলে উঠল মেয়েগুলো—'আমাদের বলছিস কেনে? উইদিকে চলে যা—'

আঙ্গুল দিয়ে কোন দিকটা দেখাল বুঝতে পারলাম না।

জিজ্ঞেস করলাম—'দেবতাকে পূজো দিলি তোরা? তা এবার অসুখ কমে গেল?'

একটার পর একটা ঘরে খোঁজ নিতে নিতে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ দেখি একটা দাওয়ার ওপর জটলা করছে একদল কুলী। মাঝখানে বসে আছে সোমরা, জ্বরের উত্তাপে কালো রংটা জ্বলজ্বলে হয়ে উঠেছে। কাছে থেকে দেখলে সোমরার শরীরটা কত ভালো বোঝা যায়। অসম্ভব অস্বাস্থ্যকর পরিশ্রম করে যারা টিকে থাকতে পারে তাদের দেহ ঐরকম হয়। স্বাভাবিক পেশী সংস্থান বিকৃত হয়ে এক এক জায়গায় চাপ বেঁধে উঠেছে শক্ত মাংসপিণ্ড। ঘাড় গর্দান পিঠ, বালা পরা শক্ত দুই বাহু—চকিত হয়ে তাকিয়ে থাকার ভঙ্গি—মনে হয় মানুষ নয় জানোয়ারের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। 'কেমন আছিস?'

সোমরা বললে—'বেমার হচ্ছে; ছাড়ছে না।'

কম্পাউণ্ডারের নজর গিয়েছিল অন্যদিকে।

'ওটা কিরে, ওটা কি !'

'বিজ্ঞাপন !'

জিনিসটা লুকোতে যাচ্ছিল ওরা। কম্পাউণ্ডার ছোঁ মেরে কেড়ে নিয়ে এল। একটা ইস্তাহার। বাঙলায় লেখা। পড়ে দেখলাম এক অদ্ভুত ইস্তাহারী ভাষায়—লেখা আছে—চা বাগানের মজুর ভাই সব—তোমাদের ওপর জুলুম হয়। তোমাদের রোজ কম দেয়, রেশন কাটে—ইত্যাদি ইত্যাদি। শেষকালে বলেছে আন্দোলন করো, এককাট্টা হও, ইউনিয়ন বানাও !

'কি করছিলি এটা নিয়ে ?'

প্রথমটা জবাব দিলে না কেউ। তারপর ধমক দিতে বললে—'দেখছিলাম। এই বিজ্ঞাপনটা কেনে দিলে আমাদের কি লিখেছে—'

'দেখছিলি কি ? বাঙলা পড়তে জানিস তোরা ?'

বিষণ্ণভাবে মাথা ঝাঁকাল সবাই। কে জানে ? পড়ালিখা কেউ জানে না।

'তবে দেখছিলি কি ?'

বয়স্ক অশিক্ষিত লোকগুলো তাকিয়ে রইল বোকার মত।

কম্পাউণ্ডার ধমক দিয়ে দিয়ে খুঁটিযে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করে বার করে আনল ব্যাপারটা। অন্য ডিবিশনের এক হাটে এক বন্ধুর সঙ্গে ফুটানী করতে গিয়েছিল একজন কুলী। হাঁড়িয়া খেয়ে হাটে ঘুরছিল, এমন সময় দেখে এক বাঙালী ছাপা বিজ্ঞাপন বিলি করছে। বাতচিত করছে। ক পয়সা দিতে হবে ? জিজ্ঞেস করেছিল কুলীটা। বাবু বলেছিল পয়সা লাগবে না। পয়সা লাগবে না ? তাই অবাক হয়ে একটা ইস্তাহার নিয়েছিল কুলীটা। জিজ্ঞেস করেছিল—কি লেখা আছে ? কত ভালো ভালো কথা বলেছিল বাবুটি। বলেছিল লেখা-পড়া যে জানে তাকে দিয়ে পড়িয়ে নিও—

কিন্তু কি বলেছিল বাবুটি বেমালুম কিছু মনে নেই কুলীটার। হাঁড়িয়া খেয়ে যা শুনেছে এক কান দিয়ে ঢুকে আর এক কান দিয়ে বেরিয়ে গেছে। সোমরা বললে উৎসুকভাবে, জুলুম হচ্ছে বাগানে।

এই কথাটা বলেছিল। কিন্তু পাগলা হয়েছিল, কুলীটা। কিছু মনে নাই।

কম্পাউণ্ডার ফিস্ ফিস্ করে বললে—'এই কুলীটাকে বার করে দিতে হবে বাগান থেকে। নইলে ডোবাবে—'

সোমরা বললে, 'তুই পড়ে দে এটা, কি লিখেছে—?'

ধমকালাম না ওদের, যা লেখা আছে ঠিক ঠিক বলে দিলাম। তারপর বললাম ছিঁড়ে ফেলে দে ওটাকে। কাছে রাখিস্ না। অবশ্য একথা বলারও প্রয়োজন ছিল না। বাঙলা ইস্তাহার, নিরক্ষর আরণ্যক লোকগুলো তা রেখেই বা কি করবে! কি বুঝল সোমরা, কে জানে মাথা ঝাঁকাল দুর্বোধ্যভাবে।

কম্পাউণ্ডার খুশী হয়নি। যা লিখেছে তার উল্টো কথাটা বানিয়ে বানিয়ে পড়ে দিলে ভালো হত বলে ওর ধারণা।

অনেকটা পথ এগিয়ে এসেছিলাম। পেছন থেকে কে ডাকল। দেখি, সোমরা পেছু পেছু আসছে। আবার কি হল।

বিষণ্ণভাবে মাথা ঝাঁকিয়ে জিজ্ঞেস করলে 'ঐটা ছিঁড়ে দিব বলছিস ?'

'হাঁ ছিঁড়ে ফেলেছিস ? কাছে রাখলে বিপদ হবে—।'

আরো কয়েকটা ঘরে ঢুঁ মেরে এলাম। বেশ রোগী আছে ঘরে ঘরে। দেবতার পূজো দিয়েও ম্যালেরিয়ার প্রকোপ কমেনি কুলী লাইনে।

বড়োবাবু ডেকে পাঠালেন কয়েকদিন বাদে। কুইনাইন এসেছে আপনার। রিটার্নে সই করে দিলাম—পঞ্চাশ পাউণ্ড।

'স্টেশনে এসে পৌঁছেছে। চা বাগানের ট্রাকে একেবারে ডাক্তারখানায় পৌঁছে দেওয়া হবে।' বড়োবাবু বললেন।

বারান্দায় ইজি চেয়ারে বসেছিলাম। বর্ষার পর অদ্ভুত নীল হয়ে জেগে উঠেছে পাহাড়। পাহাড়ের পর পাহাড়। একেবারে উঁচু চুড়ায় হাতীর দাঁতের মত শক্ত হয়ে আছে একটা তুষার-শীর্ষ। এত নিচু থেকে অল্প একটু দেখা যায় শুধু।

একটা শালগাছের নিচে কয়েকদিন থেকে বেতের ঘর তুলে ডেরা বেঁধেছে একদল পাহাড়ী মেয়ে পুরুষ। সারা শীতকালটা বেতের টুকরী বানাবে বসে বসে, তারপর বাগানে বেচে দিয়ে চলে যাবে পাহাড়ে।

কয়েকদিন থেকে আমার নিজের শরীরটা ভালো যাচ্ছিল না। হয়ত ম্যালেরিয়া ধরবে। প্রথম প্রথম এখানকার পাহাড় মাঠ খুব আশ্চর্য লেগেছিল—কিন্তু ক্রমশই ভালো লাগছে না আর। একঘেয়ে আর বুনো আর কদর্য। ডিসপেন্সারী আছে—রোগী আসে না—ছাত্র অবস্থায় পরীক্ষা পাশের জন্যেও যতটুকু বিদ্যা আয়ত্ত করেছিলাম—অনভ্যাসে তাও হারিয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। একদল মেয়ে ফিরে আসছিল বাগান থেকে। কানে লাল তালপাতার কানবালা। গলায় কালো কারে গাঁথা আধুনিক মালা। খিল খিল করে হাসছিল সবাই।

দেখি ম্যানেজার আসছেন। চেহারা দেখেই বোঝা যায় একটু মত্ত। জড়িয়ে জড়িয়ে কথা বলছেন ম্যানেজার, মাঝে মাঝে উৎসাহের বশে গাল টিপে দিচ্ছেন মেয়েদের। একটা ডবকা মেয়ের ওপরেই আক্রমণটা বেশি হচ্ছে। মেয়েটার ঘাড়ের ওপর টলে টলে পড়ছেন ম্যানেজার আর খিল খিল করে হেসে উঠছে অন্য সবাই।

রাস্তা থেকে ওদের ছেড়ে দিয়ে টলতে টলতে উঠে এলেন ডিসপেন্সারীতে। হো হো করে আপন খেয়ালে হাসলেন কিছুক্ষণ, তারপর বললেন ইংরাজীতে—শালা কুকুরীর বাচ্চা ওই সায়েবের জাত। এক একটা ডেভিল। ঐ দেবব্রত। গ্রেপ্তার করে চালান দিয়ে দেওয়া হয়েছে সদরে। পুলিস সায়েবও শাদা চামড়া। একস্‌টার্নমেণ্ট অর্ডার ইশু না করে ছাড়বে না।

হাসতে লাগলেন।

'ওহ্! একটা দুশ্চিন্তা নেমে গেল মাথা থেকে। আমাদের এ ডিবিশনে ছোঁড়াটা দেখা দেয় নি অবিশ্যি কিন্তু কি হতে পারত কে জানে।'

কুইনাইনের ট্রাকটা এসে গিয়েছিল। কম্পাউণ্ডার জিনিসগুলো নামিয়ে মিলিয়ে নিচ্ছিল।

'আর ভয় নেই! আপনার তো আবার একটু শখ আছে এদিক ওদিক একলা ঘুরে বেড়ানোর। ওয়াণ্ডারফুল সীনস। আর ভয় নেই, ইচ্ছে হলে একলাই ঘুরবেন। কুলী লাইন ঠাণ্ডা। শুনলাম এক বেটা কুলী আমাদের লাইনে ইস্তাহার নিয়ে এসে লোক ক্ষেপাচ্ছিল—ওসব কটাকে বার করে দিয়েছি বাগান থেকে।'

চমকে উঠলাম 'কে সোমরা?' 'হা হা সোমরা নাকি নাম কুলীটার'—আবার হাহা করে হাসলেন ম্যানেজার।

কম্পাউণ্ডার বললে—'কই পঞ্চাশ পাউণ্ড কুইনান তো নেই। পাউণ্ড দশেক হবে।'

'সে কি!'

কম্পাউণ্ডার উত্তর না দিয়ে ম্যানেজারের দিকে তাকাল একবার।

ম্যানেজার আড়িমুড়ি ভেঙে উঠলেন—'হ্যাঁ আমি সেইজন্যেই এসেছিলুম আপনার কাছে। দশ পাউণ্ড তো পেয়েছেন? ওটা রেখে দিন ডিসপেনসারীতে। বাকি চল্লিশ পাউণ্ড আমরা বাজারে ছাড়ছি। হিসেব-টিসেবের ভেতর যাবেন না। আপনি একটা শেয়ার পাবেন—।'

ম্যানেজার চলে গেলেন। রাত্রে জ্বর এল আমার। টের পাচ্ছিলাম আসবে। সোমরাকে বার করে দিল? কম্পাউণ্ডারকে জিজ্ঞেস করলাম।

'হুঁা শালা মরুক এবার। কোন বাগানে তো আর চাকরি দেবে না ওকে।'

জ্বরের ঘোরে জিজ্ঞেস করেছিলাম—'কি করে চলবে ওর?'

'কি করবে! ঘুরে বেড়াবে জঙ্গলেটঙ্গলে। খাশমহলে কিসানরা ক্ষেতে মজুর রাখলে খাটবে। নয়ত উপোস করবে।'

চা বাগানের চাকরিটা রাখতে পারিনি। ম্যালেরিয়াতে এত কাহিল করে ফেলেছিল যে চাকুরিতে ইস্তফা দিয়ে ফিরে এসেছিলাম শহরে।

মাস ছয়েক পরে আবার একটা চাকরি নিলাম ঐ অঞ্চলেই। কিন্তু চা বাগানের নয়—জেলাবোর্ডের দাতব্য চিকিৎসালয়ে।

এখানেও তেমন জঙ্গল মাঠ। সাঁওতাল আর ওরাও অধিবাসী। শুধু চা বাগানের কুলীর পরিবর্তে বসতির আধিয়ার কিসান। যেদিন গিয়ে পৌঁছলাম—এই অঞ্চলের কয়েকজন বর্ধিষ্ণু লোক অভ্যর্থনা করলেন আমাকে। চেহারা দেখে বুঝি নি, শুনলাম এক একজনের জমির পরিমাণ ৫০।৬০ হাজার বিঘা।

রাত্রে তাঁরা আবার এলেন। বললেন, 'আপনি শিক্ষিত। কতকগুলো টেলিগ্রাম লিখে দিন ইংরেজীতে। লিখুন মাননীয় কমিশনর সাহেব, এ অঞ্চলের বুনো কিসান আধিয়াররা দারুণ শান্তি ভঙ্গ করছে। লুটপাট করছে, ঘরে আগুন দিচ্ছে—অবিলম্বে মিলিটারী পাঠান—'

ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম—'তাই নাকি? আমাকে আগে জানান নি কেন?'

কোট পরা মোটামতো একজন জোতদার মাথা ঝাঁকাচ্ছিল আর কাঁদছিল ঝর ঝর করে। সে বললে—'তেভাগা করছে বেটারা; তেভাগা! অজগুবিয়া কথা। সব ধান নিয়া যাইবে। এই কথা শুনি ভয় লাগিছে হামার।'

মুখ দিয়ে ভর ভর করে গন্ধ বেরোচ্ছিল লোকটার। বিলাপ করছিল ক্রমাগত—'ভয় লাগিছে, বাপুরে ভয় লাগিছে।'

জিজ্ঞেস্ করলাম, 'কোথায় লুটপাট হল?' বললে, 'না এখনও হয় নি। কিন্তু ভয় লাগিছে ডাক্তার বাবু। চা বাগানের সায়েবগুলাকে তার পাঠান, ফৌজ আসুক।'

অস্বস্তি লাগছিল। জায়গাটা রোমাঞ্চকর নয়—কেমন ভয়ঙ্কর, কেমন থমথমে। দূরে একটা মাদল বাজছিল ডিম ডিম করে।

ঘুমিয়েছিলাম। দরজা ধাক্কার সঙ্গে উঠে বসলাম ধড়মড় করে। কয়েকজন অপরিচিত লোক দাঁড়িয়েছিল বাইরে। লেংটি পরা,

কনকনে শীতে উরু পর্যন্ত উন্মুক্ত। ঊর্ধ্বাঙ্গে শুধু কান ঢেকে একখানা করে সুতি চাদর।

'লোকগুলার কি হল তুই দেখে যা ডাক্তার'—

ঐ শীতের রাতে মাইল দুয়েক লোকগুলোর সঙ্গে হেঁটে গিয়ে উঠলাম একটা জায়গায়। সাদা করে নিকোনো জায়গাটার চারপাশে ধানের পুঁজ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। ধানের গাদার ওপর এক জায়গায় পড়ে আছে তিনটে লোক।

একটা লোককে দেখে চমকে উঠলাম। অস্বাভাবিক অস্বাস্থ্যকর পরিশ্রম করে বেঁচে থাকতে পারলে অমনি ভাবে পেশীসংস্থান বিকৃত হয়ে চাপ বেঁধে ওঠে এক জায়গায়। কুঁজো হয়ে যায় পিঠ, ঘাড়ে গর্দানে টানটান মাংসতে দেখায় জানোয়ারের মতো।

'সোমরা!'

'হাঁ হাঁ সোমরা, ঐ লোকটার নাম—'

ঘরের মশালটা কাছে এগিয়ে নিয়ে এল লোকগুলো। রক্তে ভেসে গেছে জায়গাটা। মাটির ওপর ভেজা একটা দাগ পড়েছে ঘোর হয়ে। মশালের আলোয় জমাট রঙের মত চিক চিক করে রক্ত।

নাড়ী দেখলাম। বহুক্ষণ মরে গেছে তিনজনেই।

বল্লাম, 'শেষ হয়ে গেছে। কি হয়েছিল?'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আস্তে বললে একজন—'গুলি করলে জোতদারে। ধান ভাগ করলাম তাই গুলি করলে—'

লক্ষ্য করি নি। হঠাৎ দেখি ওদের ভেতর কি একটা জিনিস নিয়ে তর্ক চলছে। ঝগড়া করছে নিজেদের ওঁরাও ভাষাতে।

জিজ্ঞেস করলাম, 'কি?'

একটা লোক সোমরার ওপর ঝুঁকে পড়ে ওর কোমর থেকে বার করলে কাগজটা। 'কেপটেনের বিজ্ঞাপন।' বাংলায় লেখা সেই ইস্তাহারটা। দুমড়িয়ে ভাঁজ করে করে রেখে ছেঁড়া ছেঁড়া খসখসে হয়ে গেছে ছাপা কাগজটা। রক্ত আর মাটির দাগ ভরেছে সর্বাঙ্গে।

'পড়তে জান তোমরা ?' মাথা নাড়ল সবাই—না, কেউ জানে না। কি হবে ওটাতে ?

'এই বুড়ার কাছে থাকুক ওটা। এই বুড়া সোমরার বাপ। এই বুড়া এবার থেকে কেপটেন হল আমাদের—'

কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে এল বুড়ো। কাঁপা মোটা মোটা আনাড়ী হাতে কাগজটা নিয়ে সাগ্রহে গুঁজে রাখল ট্যাকে।

অন্নপূর্ণা

জল। রাঢ়দেশের পোড়াকপালী মাটি জল চায়।

শ্রাবণের কাদায় গাড়া খোঁচা খোঁচা সবুজ বল্লমের মত ধানের চারাগুলো আশ্বিন থেকেই আবার হা-পিত্যেশ করে চেয়ে থাকে আকাশের দিকে—জল। জল না হলে তার সুতোর মত শিকড়গুলো মাটি খুঁড়ে আর নামতে পারবে না। ডগায় ডগায় আর ফুটিয়ে তুলতে পারবে না উদ্ধত শ্যাম মঞ্জরী। মাটির সম্পদ টেনে টেনে তোলে মঞ্জরীর বুক ভরিয়ে সাদা ঘন দুধের মত রসে। জল না পেলে হেমন্তের দিনে সে দুধ সহসা শক্ত হয়ে হলুদবরণী ধানের খোসার মধ্যে মধ্যে বাঁধা পড়বে না অন্নের অজস্র মুক্তোয়।

জল!

হাল-বওয়া কাঁড়া মহিষগুলো মুখ এগিয়ে দিয়ে হাঁসফাঁস করে ছুটে যেতে চায় কোথায় একটু কাদা এখনো কাঁচা আছে। কোথায় একটু জল ধরা পড়ে আছে এখনো। ঢালু ডাঙ্গার পিঠ-বয়ে-নামা সিঁড়িভাঙ্গা ছোট ছোট ক্ষেতগুলোর উদ্বৃত্ত ধারাণিটুকু উটের মত সঞ্চয় করে রাখতে চায় আঁকাবাঁকা কাঁদর আর দাঁড়া। এক-আধ পশলা বৃষ্টি হলেই মাঠে মাঠে উড়ন্ত গৈরিক ধুলো বৃষ্টির ফোঁটাকে শুষে নিয়ে ভুর ভুর করে ওঠে সোঁদা গন্ধে। আর সে গন্ধের মধ্যে দ্বিগুণ করে হা হা করে ওঠে একটা অতৃপ্ত আদিম কামনা—জল! আরো জল চাই রাঢ়প্রান্তের এই শ্বসিত খেত-মাঠ-ডাঙ্গার বুক জুড়োতে।

সেই জল নাকি এবার ধরা দেবে। দাসীর মত জন্ম জন্ম বাঁধা হয়ে থাকবে এই অঞ্চলের কৃষকদের ভুঁয়ের পাশে পাশে। হাটে-বাজারে সংসারে প্রাত্যহিক নানা কথার মধ্যে তাই অনিবার্যভাবেই এক সময় কথাটা না উঠে পারে না—'তাহলে আমাদের ইদিক দিয়েও খালটো যাবে বলছ ?'

'নিচ্চয় সদরে শুনে এলম। আদালতের বাবুদের মধ্যে ওই নিয়েই তো বলা-কওয়া হচ্ছে যি—'

প্রত্যক্ষদর্শী ভাগ্যবান কেউ কেউ সজোরেই ঘোষণা করে বসে—'বলা-কওয়া কি গো, দেখে এলম। তোমার ময়ুরাক্ষী ও সতীঘাটার পারে যন্তর-মন্তর লিয়ে বসে গেইছে একেবারে মিথ্যে লয় ···'

আর স্বপ্ন নামে। স্বাভাবিক সন্দেহ, হতাশা এবং অভিশাপ সত্ত্বেও সে স্বপ্ন না নেমে পারে না। কারণ যা আকাঙ্ক্ষার বস্তু, যা প্রয়োজনের বস্তু তাকে নিয়ে আশা করবে না, স্বপ্ন গাঁথবে না, এমন কেউ আছে না-কি ছুনিয়ায় ?

স্বপ্ন নামে, আর হিসাব শুরু হয়ে যায়। কারণ জল যদি সত্যিই আসে একদিন, যদি একদিন সত্যই ধান-লক্ষ্মী ঝাঁপি খুলে ধরেন, তবে আগে থেকেই তৈরি থাকা উচিত। আগে থেকেই হিসাব করে চলা উচিত। নয়ত জানা কথা যে, পরে ঠকতে হবে। যারা বেশি বিচক্ষণ তারা লাভ করবে, যারা বিচক্ষণ নয় তারা কপাল চাপড়াবে। আর কোন চাষী হিসাব করতে চায় না! কোন কৃষক চায় না মতলব ঠিক করে তাতে ভরসা করতে, ভবিষ্যৎ দরের আশায় আখ বুনতে, মেঘের আশায় আগে থেকে লাঙ্গল দিতে !

শুধু মাঝিপাড়ার সাঁওতালগুলো সব শুনে কেমন চাপা আক্রোশে বলে—'তুরা আনন্দ কর গো ! তুদের জমি আছে। আমাদের জমি কুথা ? আমরা কেনে আনন্দ করবো ?'

সদগোপ চাষী গেরস্তদের কেউ কেউ বলে, 'তা বটে বাপু, উযোরা যা করে তা কিছুতেই তো আমাদের সুবিধা মত হচ্ছে না। তো ইতেও যে কি কল করবে কে জানছে বাপু !'

কিন্তু সে শুধু সন্দেহ। সে সন্দেহ আশাকে সতর্ক করে মাত্র। তাকে নষ্ট করে না চাষীরা তাই অপেক্ষা করে। গাঁয়ের মাথা, ইউনিয়ন পঞ্চায়েতের সদস্য, আর বহু জমির মালিক দত্তবাবুর কাছে যায় খবর শোনার জন্যে। মামলা-মোকদ্দমায় দত্তবাবু প্রায়ই সদরে যায়। সদর থেকে ফেরার সময় সবাই ছেঁকে ধরতে চায় দত্তকে,—'তারপর কতদূর কি হচ্ছে বলুন গো। আপনারা না বললে আমরা শুনব কোথা হতে ?'

দত্তেরও তর সইত না। স্টেশন ফিরতি চলন্ত গরুর গাড়ির মধ্য থেকেই খবর শোনাত দত্ত। আঙ্গুলে আঙ্গুলে অষ্টধাতু, নীলা, পলা প্রভৃতি নানারকম অলৌকিক গুণসম্পন্ন পাথর আর ধাতুর আংটি পরা ক্ষুদে ক্ষুদে থাবার মত দুই হাতে ছইয়ের দুই পাশটায় ভর দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দত্ত কখনো বলত নতুন খবর, আশার খবর, কত কোটি টাকা 'সাংশনী' হয়েছে, বাইরে থেকে বড় বড় সাহেবরা না-কি আসতে লেগেছে। কখনো গ্রাম্য মানুষের স্বাভাবিক অবিশ্বাসের সঙ্গে অন্যকে উপদেশ দিত, 'শালারা ক্যানেল করবে না, মাথা। কেবলই লুট গো—উসব ছেড়ে দাও আশা। যেমন আছি ওই আমাদের ভালো……'

লোকে জানত দত্ত যা বলে তা হিসাব করে বলে, নিজের স্বার্থ দেখে বলে। তবু নিজের স্বার্থ কে না দেখে। আর ও ছাড়া আর কার কাছ থেকেই বা খবর শোনা যায়। তাই খবর শুনত। তারপর নিজেরা নতুন করে তা বিচার করত। অন্যান্য নানা শোনা খবর যোগ দিত। তারপর ফিরে যেত আপন আপন মনোমত এক-একটা ধারণা নিয়ে। আপন আপন মতলব নিয়ে।

চারি দিকের এই হিসাব-নিকাশের মধ্যে সৃষ্টিধরও একটা হিসেব করে নিল নিজের জন্যে।

বিঘে পাঁচেক নিজস্ব সম্পত্তি ছিল তার বাপের আমলের। কিন্তু জল এবং অন্যান্য উপকরণের অভাবে সেটা এতদিন অনাবাদী হয়েই পড়েছিল। সৃষ্টিধর বার বার করে হিসেব কষে কষে, একজনের উপদেশ আর একজনের কাছে পরখ করিয়ে করিয়ে নিয়ে বুঝল—না,

ও পাঁচ বিঘে জমি যে ডাঙ্গা হয়ে পড়েই থাকবে, তার কোনো মানে নেই।

'জল যদি আসবেন বলছো, তবে উ জমি তো পড়ে থাকার লয় ?'

'না গো, উতেও তোমার ধান হবে ষোল আনা!'

'তবে!' সৃষ্টিধর আপন মাথা ঝাঁকিয়ে হিসেব করে। আর একটা দুর্বোধ্য স্বপ্নে কঠিন হয়ে ওঠে তার বয়স্ক চোখ দুটো। তারপর সহসা একদিন বাড়ি ফিরে অকারণে সে ঝগড়া শুরু করলে তার সংসারের একমাত্র পোষ্য দূর সম্পর্কের এক বিধবা পিসীর সঙ্গে—'ওই! চিরকাল তুদের আমি খাওয়াইব না কি বলছিস? চিরকাল তুদের লেগে খেটে খেটে মরব? আমার ঘর ছেড়ে চলে যা তুরা—'

বুড়ী পিসী প্রথমে ব্যাপারটা বোঝে নি। না বোঝারই কথা। সৃষ্টিধরের সংসারে তারা আজকে আসে নি। সৃষ্টিধরের বয়স তখন বোধ হয় বছর পনের-ষোলো। বাপ মারা যাবার পর তখন আর মাথার ওপরে দেখার কেউ ছিল না। সেই সময় কি সুত্রে যেন ঐ বিধবা পিসী এসে জুটে গিয়েছিল। তারপর থেকে সে রয়েই গেছে। প্রথম প্রথম সে চাষ-আবাদের টুকি-টাকি কাজে হাত লাগাত। ধান ভেনে, চিড়ে কুটে সাশ্রয় করত সংসারের। তারপর এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে শুধুই একটা ভার, অথর্ব কর্মশক্তিহীন বুড়ী। কিন্তু কোনদিন তার জন্যে কোনো খিটিমিটি করে নি সৃষ্টিধর। কখনো ভাগ-চাষ করে, কখনো বাবুদের জমিতে কিসাণী খেটে বছরের পর বছর একলা মোষের মত মেহনত করে এক মনে সংসার চালিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে গেছে সে। বরং নিজে থেকেই মাঝে মাঝে বলেছে: 'আমার একলা খেতেও কুলাবে না, তুকে পুষলেও কুলাবে না। তাই বলি, থাকো……'

জীবনের অর্ধেকটা বছর এইভাবে চালিয়ে এসে আজ সেই সৃষ্টিধর হঠাৎ এ কি বলছে।

পিসী তার লোল-মুখটাকে হাঁ করে অবাক হয়ে বলেছিল—'হাঁ বাবা ছিষ্টি, কি বলছিস তুই!'

'হাঁ ঠিক বলছি। তুমি আমার গভ্যধারিণী মা কি যে খাওয়াইব। পথ দেখ বলে দিলম……'

অবাকের ঘোরে পিসী আরো কি একটা যেন বলতে গিয়েছিল ; কিন্তু হঠাৎ সৃষ্টিধরের চোখ দুটোর দিকে নজর পড়তে আতঙ্কে থেমে গেল।

সৃষ্টিধরের বয়স্ক চওড়া মুখটার মাঝে সে দুটো চোখ সত্যি সত্যিই এক দুর্বোধ্য নিষ্ঠুরতায় চকচক করছে।

ভয়ে বুড়ীর কথা সরেনি প্রথমটা। তারপর খনখনে গলায় ডুকরে কেঁদে উঠেছিল, 'ওগো আমার কি হবে গো, কার দুয়ারে মরব গো, তোমরা দেখে যাও……।'

কান্না শেষে করতে পারেনি। সৃষ্টিধর বুড়ীর কাঁথাকানি যা সম্পত্তি ছিল সবসমেত হিড় হিড় করে টানতে টানতে বার করে দিয়েছিল ঘরের বাইরে—'যেথাকে খুশি চলে যা। আমি কেনে খাওয়াই চিরকাল!'

বুড়ী দুইদিন দুইরাত ধরে ঘরের বাইরে রাস্তার ওপরেই বসে রইল। বসে বসে কখনো বিনিয়ে বিনিয়ে কখনো চিৎকার করে কাঁদলে। তারপর তাতেও যখন সৃষ্টিধরের মন ফিরল না, তখন পোঁটলাগুলোকে বুকের কাছে আঁকড়ে ধরে কোথায় চলে গেল কে জানে।

ভাইয়ে ভাইয়ে, বাপ-বেটায় ঝগড়া লাঠালাঠি, আত্মীয়ের প্রতি আত্মীয়ের চরম নিষ্ঠুর ব্যবহারের দৃষ্টান্ত এ অঞ্চলে নতুন নয়। যে খাটতে পারে না, সংসারে সাশ্রয় করতে পারে না, তাকে খেদিয়ে দিলেও আশ্চর্য হয় না কেউ। কিন্তু সৃষ্টিধরের বেলায় এটা নতুন।

তাই গাঁয়ের পুরানো দু-একজন লোকে অবাক না হয়ে পারে নাই —'কে জানছে বাবু উয়ার মাথায় কি ঢুকেছে……'

কিন্তু অবাক হতে তাদের আরো বাকি ছিল। হঠাৎ শোনা গেল সৃষ্টিধর নাকি বিয়ে করবে এতদিন পরে। মেয়ের বাপকে পণ দেবার জন্যে দত্তের কাছ থেকে না-কি চুপি চুপি দেনা করে এসেছে ছ'কুড়ি টাকা!

কোনদিন বিয়ে করবে সৃষ্টিধর এটা যেন ভুলেই গিয়েছিল সবাই। ছেলেবেলাতেই বাপ-মা মারা গিয়েছিল সৃষ্টিধরের। যাদের জমি-জমা

না থাকলেও মাথার ওপর বাপ-মা থাকে, তাদেরও বিয়ে আটকে থাকে না। মাথার ওপর যারা থাকে, তারা ধার-দেনা করে পণের টাকা দিয়ে বউ নিয়ে আসে। কিন্তু সৃষ্টিধরের মাথার ওপরে কেউ ছিল না। নিজের মেহনতের জোরে পণের টাকা সঞ্চয় করে ওঠাও তার ভাগ্যে হয় নি। তারপর ধীরে ধীরে বয়স বেড়ে গেছে সৃষ্টির। ধীরে ধীরে তার এক কালের সতেজ কালো শরীরটার স্বাভাবিক ছিরি ছাঁদ হারিয়ে গিয়ে জেগে উঠেছে মহুয়া গাছের পুরনো গুঁড়ির মত এক বন্ধুর রুক্ষতা। সৃষ্টিধরের যে বিয়ে হতে পারে কোনদিন একথা বোধ হয় সৃষ্টিধরও ভুলে গিয়েছিল ক্রমশ।

ঘটনাটা সত্যি কি না জানার জন্যে পাড়ার কয়েকজন কলরব করতে করতে এসে উঠেছিল সৃষ্টিধরের দাওয়ায়—'তুমার কি মতলব বলো দেখি বাবু⋯ ⋅।'

কেউ কেউ দু-একটা গ্রাম্য রসিকতারও চেষ্টা করতে চেয়েছিল; কিন্তু সৃষ্টিধরের রোদে-পোড়া কালো মুখটার মাঝখানে ধূসর চোখ দুটোর দিকে চেয়ে থেমে গিয়েছিল। নিজেরাই গম্ভীর হয়ে সমর্থন করেছিল—'তা বাপু, ই তো ধম্ম কথাই বটে। কিসেণী করুক নাই করুক, চাষীর ঘরেরই তো ছেলে উ। সংসার-ধম্ম দেখতে হবে বৈ কি! আর তোমার খালটো হয়ে গেলে তো আর ই আবস্থা রইবে না বাবু⋯⋯⋯' মেয়েরা বলেছিল—'তা মাথার উপরে বাপ নাই, দাদা নাই, উকেই তো নিজের টো নিজে দেখে লিতে হবে! আর তোমার যদি জল আসে, তবে তো উরই জমির ধান খায় কে, করে কে! একটো বউ না থাকলে চাষী তো খোঁড়া⋯⋯⋯⋯।'

সৃষ্টিধরের চোখে দুটোয় যে কাঠিন্য চক চক করছে, তাকে সবাই চেনে, সবাই বোঝে। সে ঝিলিক যে চাষীর আদিম আশা আর আকাঙ্ক্ষার ঝিলিক।

তারপর সত্যি সত্যিই ঘরে বউ এল সৃষ্টিধরের।

ছোট্ট একটা পায়ে হাঁটা মিছিল। সাতটা গাঁয়ের ওপাশ থেকে

বিয়ে শেষ করে হেঁটে হেঁটেই ফিরছিল বরযাত্রীর দল। উৎসবের সুযোগে সারা গায়ে চবচবে করে তেল মেখেছে সবাই। কালো তেলমাজা পাগুলোর ওপর গোড়ালি ছাপিয়ে জমে উঠেছে লাল ধুলো। লাল ধুলো জমেছে সৃষ্টিধরের পায়ে। বর-সাজ হিসেবে তার পরনে উঠেছে শুধু একটা নতুন কোড়া কাপড়, আর বগলে একটি নতুন ছাতা। শক্ত শক্ত ভাঁজ-পরা কপাল গড়িয়ে নামা সরষের তেলের ধারার ওপর গুঁড়ি গুঁড়ি ধুলো পড়েছে।

লম্বা লম্বা পা ফেলে সৃষ্টিধর এসেছিল আগে আগে। গাঁটছড়া বাঁধা বৌটা এসেছিল পেছন পেছন—সৃষ্টিধরের এক দূর সম্পর্কের জ্ঞাতি খুড়োর কাঁধে চেপে, অনভ্যস্ত ঘোমটার ফাক দিয়ে চারিদিকের এই অপরিচিত মাঠ-ঘাট, ঘরবাড়ি দেখতে দেখতে।

'হোই টো কনে বটে।'

বউ দেখার জন্যে উৎসাহিত হয়ে যারা ছুটে আসে, তারা খুশী হয়ে আঙুল দিয়ে দেখায়।

কেউ কেউ খিল খিল করে হেসে ওঠে—'হাঁ-রে ছিষ্টি, দেনা-কর্জা করেই যখন বিয়ে করলি, তো আর টুকবি বড়সড়ো দেখে জুটাতে লারলি! বউ বড় হতে হতে তুই যে চলে যাবি রে বোকা পরপারে…'

সৃষ্টি গম্ভীর হয়ে যায়—'তা খানিক ডাঁড়াইতে হবে বৈ কি। উতো আর এমন ছুটু চেরকাল থাকবে না। ডাঁড়াইতে হবে, অপেক্ষা করতে হবে……'

সৃষ্টিধরের কষা বয়স্ক চাষী-মুখটার দিকে তাকিয়ে তারপর কেউ আর ঠাট্টা-রগড় করেনি। বৌটা সত্যিই ছোট। বছর দশেকের বেশি বয়স হবে না। বেমাপে কেনা ঢলঢলে শস্তা রেডিমেড একটা ব্লাউজ পরান হয়েছে মেয়েটাকে! পূর্ণ বয়স্কার মাপে কাটা জামাটার গলার ফুটোটা এতই বড় হয়েছে যে, বউয়ের একটা দিকের একটা কাঁধ গোটাই বেরিয়ে এসেছে তার মধ্যে দিয়ে। ছোট্ট লাল ডুরে শাড়িটা এমন অনভ্যস্তভাবে গায়ে জড়িয়েছে যে, ঘোমটাটা খসে খসে পড়ছে বার

বার। কাঁধের ওপর জড়ো-সড়ো হয়ে পা ঝুলিয়ে বসার ফলে শাড়িটা কুঁচকিয়ে উঠে গেছে উরু পর্যন্ত।

বয়সটা নেহাৎ কচি বটে ; কিন্তু যে মেয়েদের বিয়ে হয় এ অঞ্চলে তাদের বয়সটা অমনিই হয় সাধারণত। পুরুষদের বয়স হয় সাধারণত বেশি। সৃষ্টিধরের বয়সটা শুধু আরো বেশি হয়েছে, আরো অনেক বেশি এই মাত্র। তাই খানিকটা বেমানান লাগলেও অস্বাভাবিক আর কি ? কিন্তু বৌটা সত্যিই সুন্দর।

ডাঙ্গা মাঠের পিঠ গড়িয়ে নামা বর্ষার ঢলটা সরে গেলে নিচেকার জলো জমিগুলোর কিনারে কিনারে পলিমাটির যে মসৃণ আস্তর থিতিয়ে থাকে, তেমনি মাজা ঢলঢলে গায়ের রং। নিরীহ ভাসা ভাসা গোল মুখখানির মাঝখানে হালকা উঠকো একটুখানি নাক। কোনো একদিন সোনার ফুল নাকে দিতে পারবে—এই আশায় সে নাকটিকে বুঝি ফুটো করা হয়েছিল কিছুদিন আগে। সোনার ফুলের বদলে সেখানে শুধু একটা সুতো বাঁধা।

আর সারা মুখটিকে যেন ভরাট করে, ছোট্ট কপালখানির ওপর মোটা করে কারা যেন একটি সিঁদুরের টিপ এঁকে দিয়েছে। ছেলেমানুষী নোংরা কটা কটা টান টান চুলগুলোর মাঝখান দিয়ে ধ্যাবড়া করে চাপিয়ে দিয়েছে এয়োতির সিঁদুর চিহ্ন।

বর্ষিয়সী মেয়েরা উলু দিয়ে বৌকে ঘরে তোলার সময় সত্যি সত্যিই প্রশংসা করে 'না বাপু বেশ সোন্দর হয়েছে বউ। আমাদের ছিষ্টি তো খানিক মহাদেবের পারা বটে। তো তেমনি গৌরীর পারা কনে হয়েছে……'

কেউ কেউ কি ভেবে বলে, 'না গৌরী নয়গো অন্নপুন্না! তুর ভালো হবে রে ছিষ্টি। দ্যাখ তুর ঘরে অন্নপুন্নাই এলো গো—'

সকলে আশীর্বাদ করার সময় বলে যায়—'তোমাকে মা আমরা অন্নপুন্না বলে ডাকব হোক ?' কচি মেয়েটা কি বোঝে কে জানে। মাথা নেড়ে সায় দেয় ছোট্ট করে।

সত্যি বুঝি অন্নপূর্ণা। প্রৌঢ় মহাদেবের ঘরে এই বালিকা-বধূ হঠাৎ

কেমন যেন একটা মানে নিয়ে হাজির হয় সবার কাছে। কেমন একটা আশা আর মোহের আমেজ জাগে মনের মধ্যে। বৌ-ভাতের কলার খেয়ে ঘরে ফেরার সময় কেন জানি সকলে হঠাৎ এক সময় আলোচনা শুরু করে দেয় জলের কথা, খালের কথা, ময়ূরাক্ষী বাঁধের কথা।

বলে, 'না বাবু, মনে লাগছে কি হবে……'

'হাঁ তা হবে। শুনছি তো তোমার গাড়ি গাড়ি পাথর, লোহা সব এনে ফেলিয়েছে। হবে…কিছু একটা করবে…কিছু না করে দেখাইতে লারলে উদেরও তো লাভ নাই। টাকা খেছে খুব, কিন্তুক কিছু করবে……'

অন্ধকারে হাঁটতে হাঁটতে ঘুমিয়ে পড়ার আগের অলস সুখ-চিন্তার টানে ভেসে ওঠে এক বিস্ময়কর ময়ূরাক্ষীর কাহিনী। বর্ষায় ক্ষ্যাপা এলোকেশী মূর্তি। শীতে শীর্ণ আত্মবিস্মৃত। ঘোলা জল থিতিয়ে গিয়ে পাতলা স্বচ্ছ স্রোত বিস্তীর্ণ গৈরিক বালির বুক খুঁড়ে খুঁড়ে এগিয়ে যায় অন্যমনস্কের ভঙ্গিতে। দূর থেকে তার টানা টানা ধারাগুলো দেখলে মনে হয় বুঝি তা চকচক করছে এক সচকিত বন্য ময়ূরের চোখের মত।

সেই ময়ূরাক্ষীর দেহে এবার বাঁধন পড়ছে। তার উদ্বৃত্ত ক্ষ্যাপাটে ঘোলা জলের মুখে লাগাম দিয়ে তাকে না কি আটক করা হচ্ছে এক বাঁধের মধ্যে। সিমেণ্ট আর লোহার অঙ্কুশ প্রহারে তাকে এবার ধীরে ধীরে ফিরতে হবে গাঁয়ের দিকে, ক্ষেতের দিকে। ছোটো-বড় খাল বেয়ে বেয়ে গভীর কল কল শব্দে সুধায় ভিজে উঠবে বীরভূমের পোড়া কপালী মায়ের বুক।

কে একজন হঠাৎ চুপি চুপি জিজ্ঞেস করে—'একটো কথা মনে লিছে বুইলে! ছটুবেলাতে শুনতাম কি তোমার পেরথম যখন র‍্যাল লাইন হইছিল, তখন না কি যেমন যেমন লাইন, যেমন যেমন সাঁকো তেমন তেমন নরবলি দিতে হইছিল। কুথাও একশ' আট, কুথা আরও বেশি। বুইলে! লইলে কুন্থ বড়ে কাজ তো হয় না। তো ই ব্যাপারটোয় কি করবে কুছ শুনলে?'

অন্ধকারে হাঁটতে হাঁটতে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে সবাই। কিছুক্ষণ থমকিয়ে থাকে। তারপর হঠাৎ সাহস করে বলে—'ধুর গো! উসব তোমার শোনা কথা। আগে কি হয়েছে না হয়েছে তা ছেড়ে দাও। কিন্তু এখন কি আর হয়?……'

'হাঁ উসব কথা ছেড়ে দাও' বলে নিশ্চিন্ত হবার চেষ্টা করে সবাই।

কেউ বলে—'না বাবু কিছু হবে, ওই মেয়েটুকচিকে দেখে হতে বাবু মনে লাগছে, হবে! অন্নপুন্নাই বটে'……

কিন্তু গোল বাধাল অন্নপূর্ণাই প্রথম।

বৌভাতের হাঙ্গাম চুকে যাবার পর জ্ঞাতি-কুটুম্বেরা চলে গেছে একে একে। ফুলশয্যার শযায় ডুরে শাড়ি-পরা মেয়েটা কোন সময় যেন পরম নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়েছে। মেঝের ওপর সৃষ্টিধরের সংসারে নতুন বিয়ন্ত ছাগীমাটা ছানাগুলোকে গায়ের গরমের কাছে টেনে এনে ঝিমায় আর ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস টানে মাঝে মাঝে। ফুটো চালের ফাঁক দিয়ে কয়েকটা তারা চিকমিক করে। যেন অন্ধকারে আড়ি পেতে এসেছে কৌতুকময়ী সখীর দল। তাদের কপালের কাঁচ-পোকার টিপগুলো ঝলক দিচ্ছে মাঝে মাঝে। পাশের ঝোপগুলো থেকে কাঁঠালি চাঁপার একটা গভীর ভুর ভুরে গন্ধ হাওয়ার টানে এসে সিঁদূরের দাগ দেওয়া মাটির কুলুঙ্গিটার কাছে লুটোপুটি খায়। নিঃশব্দে সৃষ্টিধর আপন মনে বিড় বিড় করে—'জল পেলে উ জমিও তো সরেস হবে। নিজের জমি মেয়ে-মরদ দু'জনায় খাটলে কেনে হবে না……'

এমন সময় হঠাৎ আতঙ্কে কেঁদে উঠেছিল মেয়েটা—'ও বাবাগো, কুথায় ফেলে পালালি গো! হেথায় আমি থাকতে লারব! তুরা লিয়ে যা আমাকে ওগো বাবাগো—'

সৃষ্টিধর টের পায় নি, কোন সময় যেন বিছানার ওপর উঠে বসেছিল মেয়েটা। কালি-পরা কুলুঙ্গীটা থেকে কেরোসিনের আবছা আলো এসে পড়েছিল সৃষ্টিধরের চওড়া ঝড়-দাগা বয়স্ক মুখটার ওপর। ঘুমভাঙ্গা চোখে এদিক-ওদিক তাকিয়ে হঠাৎ এই নিঃশব্দ অপরিচিত

ঘরটায় এই অপরিচিত প্রকাণ্ড মানুষটাকে দেখে হঠাৎ এক আদিম ভয়ে চিৎকার করে উঠেছে মেয়েটা—'ওগো বা গো! হেথায় থাকতে লারব, থাকতে লারব—'

বিব্রত হয়ে সৃষ্টিধর সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করেছিল প্রথমটা। থতমত খাওয়া অনভ্যস্ত আনাড়ী হাতে মেয়েটাকে চাপড় মেরে মেরে বোকার মত বলছিল—'কুছু ভয় নাই! কুছু ভয় নাই! ঘুমাও। ই তো তোমারই ঘর বটে, তোমারই সংসার। কুছু ভয় নাই…'

কিন্তু তাতে আরো চিৎকার করে উঠেছে মেয়েটা। আরো কেঁদে উঠেছে। সে কান্না মেয়েটার থামে নি।

প্রথম প্রথম সে চিৎকার শুনে পাড়ার মেয়েরা বলেছিল, ও রকম হয়। ছোট মেয়েকে বিয়ে করে আনা কিছুই অস্বাভাবিক নয়। বাপের পরিচিত সঙ্গী-সাথী আর পরিচিত দুঃখ-দুর্দশা ছেড়ে শ্বশুর বাড়িতে অপরিচিত লোকজন আর অপরিচিত দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে যেতে কারই বা মন চায়! তাই সকলেই কাঁদে। এখন যারা এয়োতি, তারাও কেঁদেছিল এক সময়। তাদের যারা শাশুড়ী, তারাও কেঁদেছিল। এমনি হয়ে এসেছে চিরকাল। প্রথম প্রথম কাঁদে, কেঁদে বুক ভাসিয়ে দেয়। তারপর ঠিক হয়ে যায়। কখন জানতেও পারে না, নতুন সংসারে মন পড়ে গেছে আপনা থেকেই। ধীরে ধীরে ভালোবাসায় বুক ভরে উঠেছে কখন।

কিন্তু কেমন যেন আলাদা হয়ে বেড়ে উঠল বৌটা। সারা দিন থাকে, ঘোরে ফেরে। ছাগলটার জন্যে পাতা পেড়ে আনে বন থেকে। জামবাটি করে ভাত বয়ে নিয়ে যায় মাঠে। রাখাল ছেলেগুলোর সঙ্গে ছুটোপুটি করে বৈঁচি ফল খুঁজে বেড়ায় কাঁটা গাছের মধ্যে। বেশ থাকে। তারপর হঠাৎ শোনা যায় থেকে থেকে শঙ্খচিলের মত একটা চেরা আওয়াজ,—'বাবাগো, হেথায় আমি থাকতে লারব। তুদের দুটি পায়ে পড়ি, লিয়ে যা…' সৃষ্টিধরকে দেখে প্রথম যে ও ভয় পেয়েছিল, সে ভয় আর গেল না।

পাড়ার বৌঝিরা প্রথম প্রথম বুঝ দিত, সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করত। তারা হাল ছেড়ে দিয়ে বলেছে—'কপাল করে আচ্ছা বউ নিয়ে এসেছে বাবু আমাদের ছিষ্টি।'

কেউ কেউ উপদেশ দিল—'খানিক শাসন করিস ছিষ্টি। লইলে উর কান্না যাবে না। এই অব্যেস তো ভালো লয়........'

সৃষ্টিধর তাই একদিন সত্যি সত্যিই শাসন করলে বৌটাকে। ওর পাঁওটে পাঁওটে চুলের গোছা চেপে ধরে শক্ত চাষাড়ে হাতে ধাঁই ধাঁই করে চড় মারল এলোপাথারি। তারপর কি ভেবে থেমে গেল। যারা উপদেশ দিয়েছিল, তাদের বললে অন্যমনস্কের মত—'রপেক্ষা করতে হয়, ডাঁড়াইতে হয়। হুটোপাটি করলে চলে! আমাদের চাষাদের তো ই লতুন নয়! একদিন তো বড়ো হবেই। রপেক্ষা করতে হবে বৈকি!'

একমাস দুই মাস, একবছর দুই বছর তিন বছর—সৃষ্টিধর অপেক্ষা করে। আরো অপেক্ষা করতে সে রাজী। চাষীর ছেলে সে জানে হুটোপুটি করতে হয় না। অপেক্ষা করতে হয়। বর্ষায় ধান বুনে অপেক্ষা করতে হয় হেমন্তের জন্য। তালগাছ পুঁতে অপেক্ষা করতে হয় নাতিদের জন্য।

তবু থেকে থেকে শঙ্খচিলের মত চেরা গলায় কেঁদে ওঠা মেয়েটার গেল না।

এদিকে একমাস যায় দুই মাস যায়, একবছর দুবছর তিন বছর পেরিয়ে যায় জল আর আসে না। কখনো শোনা যায় আরো কত কোটি টাকা যেন স্যাংশন হয়েছে। কখনো শোনা যায় হিসাবে কি গোলমাল হয়েছে। কখনো খবর আসে কলকাতা থেকে নাকি সরাসরি মোটরের পর মোটরে করে সাহেব, পুলিশ আর মন্ত্রীরা এসে হাজির হয়েছে; গলায় ফুলের মালা পরে বক্তৃতা দিচ্ছে; এইবার নাকি আবার কাজ এগুবে। কখনো সদর ফেরত লোকেরা জানায়, 'ধুর গো! টাকা খেয়ে খেয়ে পেট মোটা করছে। এখন বলে কিনা যেটুকচি বাঁধ বেঁধেছিল, তা নাকি নদীতে ভেসে গেইছে। ওই! এত বড়ো বড়ো সাহেব এনে টাকা নিয়ে বাঁধ বাঁধলি তো ভেসে যাবে কেমন?'

কিন্তু তাই নাকি ভেসে গেছে এত পলকা ফাঁকি দেওয়া বাঁধ। তাই বছরের পর বছর যায়। পেট্রল পোড়ে। হাওয়া গাড়ি যায় হুস করে। দত্ত ঘোরাঘুরি করে সদরে। তারপর কখনো বলে 'যেমন ছিলাম তেমনি ভালো বাবু! টাকাগুলো সব লুটেপুটে খেচে গো!'

কখনো গম্ভীর হয়ে বলে—'না বাবু। দেরি হচ্ছে খানিক। কিন্তু হবে।'

একবছর দুবছর তিন বছর চার বছর – জল যেন আসি আসি করেও আসে না। আর একটা মরীচিকা ঝিকিমিকি করেও মরে না।

জলের আশায় দত্ত একবার সাত তাড়াতাড়ি তার ভাগে বিলি জমিগুলো ছুটিয়ে আনল সাঁওতালদের কাছ থেকে। বললে—'তুদেরই তো মজা রে, খাটবি, খাটালি মিলবে খুব এবার। মজুরি দিবে কোম্পানি। তবে আমাকেও তো দেখতে হবে। খালটা যদি আসে তবে ই জমিগুলো তো আর এখন রইবে না। আমার লাভটো বুঝেও তো চলতে হবে!'

দত্তের অনেক জমি। তার মধ্যে এই দূরের নীরেস জমিগুলো সে এতদিন সাঁওতালদের কাছে ভাগে দিয়ে এসেছে।

কিন্তু জলের দেরি দেখে আবার একদিন সাঁওতালদের ডেকে আনল—'আচ্ছা ইবছরটাও তুরা কর খানিক। তবে তুদের স্বত্ব রইবে না বলে দিলাম।' বলে এক একটা সাদা কাগজে টিপসহি করিয়ে নিল সবার।

অন্যান্য ছোট ছোট জোতজমার মালিক ক্ষুদে চাষী আশা করে আর নিরাশ হয়ে ক্রমে ক্রমে আর ক্যানেলের কথা নিয়ে আলোচনা করতেও উৎসাহ বোধ করে না। বলে, 'যা হবে হবে। ইদিকে কাপড়ের লেগে বলে বাড়ির মেয়েগুলান ঘরের বার হনে লারছে। সেই তাল্লাস করতেই হায়রান হয়ে গেলাম…'

কেউ বলে 'যা বলেছ বাবু! খাল হবে, জল হবে, ইলেকটিরি হবে, ধান হবে? তো ধান হলে তো সেই উয়ারাই সীজ করে লিয়ে যাবে! না কি বলছ?'

'এ্যাই !'

শুধু সৃষ্টিধর কোন আলোচনা করত না। কোন মন্তব্যে সায় দিত না। বিয়ের পর থেকে সে দেনাটা শোধ দিতে পারে নি। সেই জন্য দত্তের জমিতে কিসেণীর কাজে লেগেছে। সর্ত হয়েছে ফসল থেকে কেটে কেটে রেখে দত্ত তার সুদ এবং পারলে দেনার কিছুটা করে উশুল নিয়ে রাখবে। কিসেণ লাগিয়ে যে জমিগুলো দত্ত চাষ করায় সেগুলো ভালো জমি। সেগুলোর তদারক করে দত্ত নিজে। তাই খাটুনি ছিল তার বেশি। কিন্তু তাতে আফশোস করতে দেখা যায় নি ওকে। শুধু মাঝে মাঝে দত্তর হেলে গরুগুলোর জন্য ছানি কাটতে কাটতে মুখ তুলে জিগ্যেস করে ঝালিয়ে নিত—'তাহলে জলটো তো একদিন না একদিন আসবেন তো ঠিকই, না কি বলছো গো ?'

দত্ত তামাক খেতে খেতে বলত— 'হাঁ তা আসবে বৈকি'···তারপর মাঝে মাঝে অবাক হয়ে আপন মনেই বলে উঠত 'ওই ! ই চাষাটোর চোখ ছুটো দেখ গো ! বাবা !'

সত্যিই চমকে ওঠার কথা। সৃষ্টিধরের চওড়া ঘর্মাক্ত মুখে কুটি কুটি ছানি লেগে রয়েছে। আর তার মধ্যে প্রৌঢ় একজোড়া চোখ কিসের জন্যে যেন অধীর আগ্রহে ঝকমক করছে।

সন্ধ্যে পর্যন্ত দত্তর জমিতে গোলামী খেটে সৃষ্টিধর তারপর চলে যেত তার নিজের জমিতে। অনাবাদী জমি। উপযুক্ত জলের অভাবে ডাঙ্গার মত হয়ে আছে। সমস্ত এলাকাটাই যেন ডাঙ্গা পাথর। দূরে কয়েকটা বেঁটে বেঁটে খেজুর গাছ প্রেতের মত দাঁড়িয়ে থাকে অন্ধকারে। সৃষ্টিধর একলা আসে না। তেলের কুপী জ্বালিয়ে বউটাও আসে পিছু পিছু। তারপর একজায়গায় বসে বসে ঝিমোয়।

আর সৃষ্টিধর কোদাল চালিয়ে যায় ডাঙ্গাটায়। আগে থেকে কোদাল চালিয়ে রাখলে পরে সুবিধা। পরে ক্যানেল এলে, জল এলে জমি তৈরি করে নিতে বেগ পেতে হবে না !

কোদাল চালাতে চালাতে সৃষ্টিধর বিড় বিড় করে বকে—'ধ্বপেক্ষা কর্‌তে হবে বৈকি। চাষীর ঘরের ছেলে ধ্বপেক্ষা করতে না শিখলে চল্‌বে কেনে?'

লোকে বলে সৃষ্টিধর নাকি এ বছরে হঠাৎ কেমন বুড়ো হয়ে গিয়েছে। মাথার ছোট ছোট খোঁচা খোঁচা চুলগুলোয় পাক ধরেছে সর্বনাশা!

তারপর সত্যি সত্যিই একদিন হুড়মুড় করে যেন ক্যানেলটা এসে পড়ল একেবারে তাদের এলাকার কাছাকাছি। সত্যি সত্যিই নাকি ময়ুরাক্ষীর কোন একটা বাঁকে পাথর আর লোহার এক আশ্চর্য ফটক বানানো শেষ হয়ে গিয়েছে। ক্যানেল ছুটতে শুরু করেছে চারিদিকে। গ্রাম থেকে মাত্র ক্রোশ দুই-তিনের মধ্যেই নাকি তাঁবু খাটিয়ে ঘাঁটি গেড়েছে কোম্পানির লোকজন। খাল খোঁড়া হচ্ছে কিন্তু কোদাল লাগছে না, ঝুড়ি লাগছে না। ঘড় ঘড় শব্দ করতে করতে বিরাট এক যন্ত্র নাকি শক্ত লাল কাঁকুরে মাটি তুলছে কামড়ে কামড়ে। তারপর লম্বা লম্বা শেকলে ঝুলতে ঝুলতে সে মাটি টিপ দিয়ে পড়ছে খালের দুই পাশে।

ছাই-চাপা ধিকিধিকি স্বপ্নটা আবার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। আবার হিসাব নিকাশ জোর ধরে নতুন করে। শুধু কেমন মুষড়ে পড়ে আর কেউ নয় দত্ত স্বয়ং। গাঁয়ের চেয়ে সদরেই সে হঠাৎ ছোটাছুটি করতে শুরু করে বেশি বেশ। চাষীরা খবর জানতে চাইলে মেজাজ খারাপ করে উত্তর দিত—'ক্যানেল না ছাই! দশ টাকা করে খাজনা বসছে। সে হিসাব রাখিস? ইদিকে তো লাফাচ্ছিস্। তুদের আর কি। তুদের জমি কম, খাজনাও কম। আমারই ভাবনা। ইদিকে জল যে শেষ পর্যন্ত কি হবে গঙ্গাই জানেন।'

দত্তের এই কথায় চাষীরা সামনে কিছু বলত না। আড়ালে হাসত হিংসুক আনন্দে, চাপা উল্লাসে, 'শালা জব্দে পড়েছে খুব। তাই মিথ্যে কথা বলছে কেমন? আমাদের বুঝ দিয়ে গেলেই কি আর লুকে বুঝে। আমরা জানি জানি...'

দত্ত যে কথাটা চাপতে চাইত, সে কথাটা কেমন করে যেন আগেই ফাঁস হয়ে গিয়েছিল চাষীদের কাছে। আসলে দত্তের মুখভারের কারণ হল ক্যানেলের জন্যে নাকি সরকারকে তার ভালো জমিগুলোর অনেকখানিই ছেড়ে দিতে হবে। দাম পাবে বটে, কিন্তু যে লোকসান হবে তাকি আর ওই দামে পোষায়!

লোকে আড়ালে বলে 'বেশ হয়েছে। ওই পেট-মোটাটাই যেমন লাকাচ্ছিল—তোর উরই, কপালে ঠক্ ঠক্। সেই যে বলে অতি বাড় বেড়ো না ঝড়ে ভেঙ্গে যাবে! তো তাই হয়েছে এবার....'

আর হিংসুক আনন্দে, চাপা উত্তেজনায় দিন গুণতে থাকে।

শুধু সাঁওতাল পাড়ার লোকেরা রাগ করে, ক্ষেপে ওঠে মাঝে মাঝে। বলে 'তুরা আনন্দ করছিস, কিন্তু আমরা খাব কি। দত্ত জমি ছুটিয়ে লিলে। বললে, ক্যানেলে কাজ মিলবে। তো কই। উসব যন্ত্র লিয়ে এসেছে। বলছে, না, অত মুনিষ চাই না আমাদের! তো আমরা কি খাব বল?'

কিন্তু যাকে নিয়ে এত ভাবনা সেই ক্যানেলটাই আবার থমকে রইল কিছুদিন। কর্মচারীদের কেউ কেউ বললে—'আবার কি একটা জানি গণ্ডগোল হয়েছে। তবে বড়ো গণ্ডগোল নয়। শীগগীরই মিটে যাবে...'

তারপর আবার চলতে লাগল ক্যানেল। হঠাৎ একেবারে হুড়মুড় করে চলে এল একেবারে গাঁয়ের ওপর। সমস্ত গাঁ খানাকে সচকিত করে একটা জীপ আর একটা ট্রাক এসে থামল গাঁয়ের মাঝখানে। তা থেকে চটপট করে নামল সরকারী লোকজনেরা। মাথায় মোটা মোটা শোলার টুপি। কারো হাফপ্যান্ট, কারো পুরো। কারো হাতে পেন্সিল, কারো হাতে মাপজোক করার নানারকম যন্ত্র।

বুড়ীরা অবাক হয়ে দেখে জিগ্যেস করলে—'হাগো ওনগুলা দিয়ে মাটি খুঁড়বে কেমন করে গো?'

ওরা হেসে বলল, 'না ওরা মাটি খুঁড়তে আসে নি। ক্যানেলের প্রস্তাবিত পথটা তারা শুধু শেষবারের মত জরীপ করতে এসেছে।

জরীপ করে জায়গায় নিশান পুঁতে চলে যাবে। তারপর সময় মত খোঁড়া শুরু হবে।'

'ভালো! ভালো!' মাতব্বর দু'একজন সায় দিলে উৎসাহে।

খবর পেয়ে দত্ত এসে হাজির। বিনীতভাবে ওদের বললে—'আহা সে সব পরে হবে জলযোগ কিছু করা হোক এখন, পরে ওসব তো আছেই....'

অনেক দিন দত্তকে দেখা যায় নি গাঁয়ে। আজ ঠিক দিন বুঝেই যেন এসেছে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত সরকারী লোকগুলো যা বললে তাতে একেবারে হাঁ হাঁ করে উঠল সারা গ্রামটা—'ই কি বলছেন মশায়, ইদিক দিয়ে খাল যাবার তো কথা ছিল না?'

'ওই বাবু, আমার জমি টুকচি লিবেন কি বাবু! খাল তো দত্তের জমির উপর দিয়ে যাবেন....'

চারিদিকের তুমুল কলরবের ফলে ইঞ্জিনীয়ার ওভারসিয়াররা আবার নিজেদের কিসব কাগজপত্র দেখলে। নিজেদের মধ্যে ইংরেজীতে কিসব বলাকওয়া করলে। তারপর জানাল, না, দত্তের জমি রিকুইজিশন করার কোন হুকুম তাদের নেই। প্রথমে একটা প্লান হয়েছিল বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা বদলে এইটে ফাইন্যাল হয়েছে···

দত্ত তড়বড় করে জানাল—'হাঁ গো হাঁ সাহেবরা ঠিকই বলছে। ই লুটিসও এসে গেছে, আমাদের পঞ্চায়েতের অফিসে। না জেনে তুরা হৈ চৈ লাগিয়েছিস বাবু'....বলে অফিসারগুলোর দিকে তাকিয়ে বিনীতভাবে খ্যাক্ খ্যাক্ করে হাসতে লাগল বন-বিড়ালের মত।

সমস্ত স্বপ্ন যেন এক মুহূর্তে এক দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়ে গেছে। দেখা গেল ক্যানেলটা এমনভাবে ধার ঘেঁসে যাবে যাতে দত্তের জমিগুলো সব বেঁচে যায়। কিন্তু সাধারণ চাষীদের অনেকেই তাদের ক্ষুদে ক্ষুদে জমিখণ্ডগুলোর কোনোটা আংশিক কোনোটা বা সম্পূর্ণই ছেড়ে দিতে হবে সরকারকে।

আতঙ্কিত বিস্ফারিত মুখে এক-একজন এগিয়ে এসে জিগ্যেস করে, 'আমার জমিটো লিবে তুমরা ?'

'হাঁ। তাইত অর্ডার রয়েছে। তবে সব নয়, খানিকটা....'

"আমার জমিটোও ?"

'হাঁ !'

হঠাৎ কোথা থেকে যেন খবর পেয়ে ছুটতে ছুটতে আসে সৃষ্টিধর। জমিতে আল বাঁধছিল বোধ হয়। এই অবস্থাতেই ছুটে এসেছে। গায়ে-গতরে মাটি লাগা। কাঁধে একটা কাদামাখা কোদাল। হাঁপাতে হাঁপাতে কম্পিত ভাঙ্গা গলায় জিজ্ঞেস করে—'আমার ডাঙ্গা জমিটো দেখুন হুজর।'

আমলা অফিসররা অবাক হয়ে এই অদ্ভুত মানুষটার দিকে চায়। ভেঙ্গেপড়া কাঁপা হাড়ের কাঠামোর এই ধ্বংসাবশেষ চাষী মূর্তিটার দিকে। এই কবছরে আশ্চর্য রকম শরীর ভেঙ্গে গেছে সৃষ্টিধরের। বয়স্ক মনে হয় না তাকে, প্রৌঢ়ও মনে হয় না আর। মনে হয় বুড়ো একটা।

শুধু তার লোল কুঁজো দুমড়ে আসা দেহভঙ্গির মাঝে এক আদিম আকাঙ্ক্ষায়, এক দুর্বোধ্য অপেক্ষায় চক্ চক্ করে একজোড়া চাষীর চোখ।

ভাঙ্গা হেঁড়ে গলায় সৃষ্টিধর আবার মিনতি করে 'দেখন হুজুর দয়া করে—'

শোলার টুপি পরা অফিসারটা কাগজপত্র দেখে অস্বস্তিভাবে জানায়, 'না বাপু, তোমার জমিটায় লাগবে। ওইখানে সলুইস গেট বসবে··· তবে ভাবনা নাই, দাম পাবে ··'

'দাম পাব ?' সৃষ্টিধর হাঁ-করে পুনরাবৃত্তি করে কথাটার, হাঁ-করে একবার তাকায় অফিসারগুলোর দিকে, আশেপাশের লোকগুলোর দিকে। তারপর হঠাৎ সাঁ করে কাদামাখা কোদালটা তুলে বসিয়ে দিল দত্তের মাথা লক্ষ্য করে। তারপর টলতে টলতে এগিয়ে গিয়ে দূরের একটা খেঁজুর গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে রইল চুপ করে।

সমস্ত ঘটনাটা ঘটে যাবার পর হঠাৎ যেন হুঁশ হয় সবার। সরকারী আমলারাই হৈচৈ করে ওঠে সবার আগে—'আচ্ছা খুনে জায়গা রে

বাবা! এই তোরা চুপ করে কি দেখছিস? আচ্ছা খুনে জায়গা বাবু!'

কয়েকজন অনিচ্ছা সত্ত্বেও গিয়ে দাঁড়াল ভূলুণ্ঠিত দত্তের কাছে। না দত্ত মরে নি, জখমও হয়নি বিশেষ। বুড়ো স্থষ্টিধরের হাতের জোর ছিল না বোধ হয়। তাই খুব বেঁচে গেছে। দত্ত জ্ঞান ফিরেই হাউ-মাউ করে কেঁদে উঠল 'হেই তুদের পায়ে পড়ি, মারিস না গো, মারিস না, তুদের পায়ে পড়ি।'

দত্তকে ধরাধরি করে বাড়ি পৌঁছে দেবার পর হঠাৎ সবার খেয়াল হল, স্থষ্টিধর কই। পালাল নাকি?

না পালায় নি। কোদাল ছুঁড়ে মারার পর টলতে টলতে গিয়ে যে গাছের গুঁড়িটাতে ঠেস দিয়ে বসেছিল, সেখানেই বসে আছে। গায়ে হাত দিতে গিয়েই চমকে উঠল সবাই—'ই কি মাশায়! ই যে ঠাণ্ডা একেবারে।'

সত্যিই ঠাণ্ডা। গাছে ঠেস দিয়ে বসে আছে বটে, কিন্তু ঠাণ্ডা দেহে তার প্রাণ নেই। শুকনো তোবড়ানো মুখটা হাঁ-করে আছে। শুধু চোখ দুটো বোঁজা। অপেক্ষা করতে রাজী ছিল স্থষ্টিধর, কিন্তু পারল না।

জল! সত্যিই বুঝি জল আসবে অবশেষে। রাঢ়ের নিষ্ঠুর লাল মাটিকে সুধায় ভরে দিয়ে ক্যানেলে ক্যানেলে নালায় নালায় বুঝি ছড়িয়ে পড়বে ময়ূরাক্ষীর গৈরিক আশীর্বাদ। শক্ত ভুঁইয়ে নখর গেঁথে রুখে ওঠা কঠোর তালবনগুলোর চারিপাশে জাগবে কালো মেঘের মত ধান ক্ষেতের সঘন উচ্ছ্বাস। হেমন্তের সিঁদুরমুখী আকাশকে আলোড়িত করে বুঝি স্বপ্নের নূপুরের মত গভীর শব্দে ঝমঝম করে বাজবে নুয়ে-পড়া পাকা ধানের মঞ্জরী।

হঠাৎ এক তীক্ষ্ণ ভয়ার্ত আর্তনাদে কে কেঁদে ওঠে চিৎকার করে, 'উরা মেরে ফেলাইবে গো। আমি হেথায় থাকতে লারব…'

সাঁওতাল পাড়ার সাঁওতালগুলো কাজ না পেয়ে মিছিল করে যাচ্ছিল সদরে। কান্না শুনে তারা থমকে দাঁড়ায়—

কে কাঁদে, কে ?

অন্নপূর্ণা !

ধুলোর মধ্যে লুটিয়ে লুটিয়ে বুকভাঙ্গা কান্না কাঁদছে মেয়েটা। এই কবছরের মধ্যে হঠাৎ কখন যেন বড়ো হয়ে উঠেছে অন্নপূর্ণা। সারা দেহে জাগি জাগি করে উঠেছে এক নতুন মায়া। চোখ ভরে ছায়া পড়েছে এক নতুন মেঘের। শুধু পড়শীরা তার চুল কেটে দিয়েছে। ঘসে ঘসে উঠিয়ে ফেলেছে মাথার সিঁদুর। বিধবার বেশে লুটিয়ে লুটিয়ে হাহাকার করে কাঁদছে অন্নপূর্ণা।

আগে মেয়েটা সৃষ্টিধরকে দেখে ভয় পেত। এখন কাকে দেখে ভয় পেয়েছে কে জানে।

'ওগো বাবাগো, আমি হেথায় থাকতে লারব। মেরে ফেলাইবে গো ! মেরে ফেলাইবে গো, বাবা ...'

ঝাঁঝাল পেট্রলের গন্ধে ছিঁড়ে ছিঁড়ে ওঠে সেই কান্না। শুকনো ঘাস-ঢাকা চাঙ চাঙ মাটি তোলা অতিকায় মার্কিনী ড্রাগ লাইনটার কর্কশ একঘেয়ে শব্দটাকে ছাপিয়ে ছাপিযে ওঠে অন্নপূর্ণার চেরা গলার চিৎকার। এখানে-ওখানে পোঁতা শালের খুঁটি, ক্রেন আর আর বিদেশী যন্ত্রগুলোকে হঠাৎ মনে হয় বুঝি কোন আদিম জন্তুর কঙ্কাল। যেন সেই কঙ্কালগুলো চেয়ে চেয়ে মাটি থেকে গুমরে ওঠে এক আতঙ্কিত কিশোরীর কণ্ঠস্বর—'থাকতে লারব গো বাবা, আমাকে মেরে ফেলাইবে !'

অন্নপূর্ণা কাঁদছে।

পাওয়া না পাওয়া

সকলেই বুঝতে পারছে ও বাঁচবে না! এবার ওকে মরে যেতে হবে।

খুব একটা সোরগোল-তোলা মৃত্যু এ নয়। মামুলী, বিবর্ণ। দীর্ঘদিন টিকে থেকে তারপর ধীরে ধীরে ক্ষয়ে ক্ষয়ে অনিচ্ছায় ভাঙতে ভাঙতে, জীবনীশক্তির শেষ বিন্দুটিকে পর্যন্ত ক্ষুধার্তের মতো লেহন করতে করতে হঠাৎ আর-কিছুই-নেই এই ভয়ঙ্কর শূণ্যতার মুখোমুখি হয়ে মৃত্যু।

হাসপাতালের বিনা পয়সার রোগ-শয্যায় শুয়ে আছে ও কদিন। চেনা-পরিচিত বন্ধু-বান্ধব আছে জনকয়েক। তারাই কোনো রকমে এই ব্যবস্থাটুকু করে দিয়েছে। তারা জানে ও মরছে। দুচার পয়সা চাঁদা তারা তোলে নিজেদের মধ্যে থেকে। দু একটা ফলও নিয়ে আসে মাঝে মাঝে। এলোমেলো কথা বলে দু চারটে। সান্ত্বনা দেয়। সে সান্ত্বনা মিথ্যে তা ও বুঝতে পারছে জেনেও দেয়। তারপর একজন মানুষ মরে গেলেও যেসব কাজ চলতে থাকবে, যেসব কাজ চালিয়ে যেতে হবে— তার টুকিটাকি হিসেব করে। ভোর শিপটের গেট মিটিংটার জন্যে কি ব্যবস্থা করতে হবে, বস্তির কতোজন টিপসই দিল, রবিবার কারা কারা বেরুবে—এই সব। একজন মানুষের মৃত্যুর শিয়রে বসেও ওরা এই সব কথা বলে অনায়াসে, তারপর ঐ ধরনেরই কোনো কাজের তাড়ায় চলে যায় আবার।

আর সবাই চলে যাবার পরেও বসে থাকে শুধু একজন, ওর মা। হাসপাতালের দারোয়ানটার হাতে সাক্ষাৎ-সমাপ্তির নির্বিকার ঘণ্টাটা বেজে যায় যন্ত্রের মতো। কয়েকজন ওয়ার্ডার আর আয়া এসে নির্বিকারভাবে হাসপাতালের বেডগুলো ঠিক করে দিতে থাকে একটার পর একটা। যে রোগীটা মরে গেছে তার চারপাশে ঢাকা দেবার লাল পর্দাটা জমাদার নিয়ে আসে টানতে টানতে। বাইরের আকাশে আলো থাকতে থাকতেই ভেতরে সন্ধ্যার আলো জ্বলে ওঠে টিমটিমে। নিষ্প্রাণ মেঝের ওপর নার্স আর ডাক্তারদের জুতোর শব্দ এগিয়ে আসতে থাকে ঠক্‌ঠক্‌ করে।

তখনো বসে থাকে বুড়ীটা—ওর মা। বসে বসে চেয়ে থাকে ওর শুকিয়ে আসা ফাটাফাটা জীবন-খুইয়ে-বসা গতানুগতিক মুখখানার দিকে। মাঝে মাঝে ঝুঁকে পড়ে ও প্রায় স্তব্ধ চাদরে ঢাকা দেহটার ওপর, লোল চোখে কাঁপতে কাঁপতে কি যেন খোঁজে ওর মুখের মধ্যে, কি যেন দেখতে চায়, কি শুনতে চায়।

আর চোখ বুঁজে থেকেও ও কেঁপে ওঠে ভেতরে ভেতরে। চোখ বুঁজে থেকেও ও জানে তার বুড়ী মার লোল চোখে একটা স্নেহার্ত অসহ্য প্রশ্ন কাঁপছে—কী হল ? শেষ পর্যন্ত কী পেলি তুই !

শেষ মুহূর্তটুকুতেও এই অসহ্য পীড়াদায়ক প্রশ্নটাকে শুনতে হবে—তা ও চায়নি।

বন্ধুবান্ধব বেশ পরিচিত যে কয়জন ছিল, তারা বলেছিল—তোর মাকে খবর দিই !

ও কেঁপে উঠেছিল আতঙ্কে, না ! না।

এই শেষ মুহূর্তে ওর মায়ের সেই অবুঝ অপ্রতিরোধ্য প্রশ্নটার মুখোমুখী হবার শক্তি তার নেই। কী জবাব দেবে ও। কী জবাব দিতে পারে। এ প্রশ্ন তাড়া করে বেরিয়েছে ওকে সারা জীবন অথচ —আজ এই মুহূর্তেই মাত্র সে অনুভব করতে পারছে সত্যি করে কোনো দিন তার জবাব দিতে ও পারে নি।

আর পাঁচটা বুদ্ধিজীবী ছেলের মতো সেও এসেছিল এক নিম্নমধ্যবিত্ত

সংসার থেকে খসে। এ আসাটা সেদিন তার কাছে ছিল এক গর্বের বস্তু—উত্তেজনার বস্তু। কি পাচ্ছে সেটা ভাবেনি, কি ছাড়ছে সেইটেই ছিল বড়। হ্যাঁ, সে ছেড়েছিল পুরোনো জগতটাকে।—মামুলী আকাঙ্ক্ষা আর মামুলী কারুণ্যের গা ঘেঁষাঘেঁষি অভ্যস্ত আরামটুকুকে সে একদা তুচ্ছ করেছিল সদম্ভে।

''তা হলে কি করবি তুই? কি করতে চাস?' রাগ করে জিগ্যেস করেছিল ওর মা। জিগ্যেস করেছিল পুরোনো জগতটার সমস্ত মমতা আর সমস্ত অবিশ্বাসের প্রতিনিধির মতো।

'অন্য কিছু—', ও জবাব দিয়েছিল স্বপ্নে। কে জানে কিসের স্বপ্ন।

কিন্তু সত্যি কি জবাব দিয়েছিল? না, জবাব দিতে পারে নি। জবাব এড়িয়ে গেছে। জবাব সে জানত না।

আর এগিয়ে গেছে সময়। পুরোনো জগৎ থেকে খসে ওর পথটাও গেছে এগিয়ে। কিন্তু প্রশ্নকে এড়াতে পারে নি।

ওই পুরনো জগৎটা থেকে মাঝে মাঝেই এসে দাঁড়িয়েছে ওর মা, সন্দিগ্ধ চোখ বুলিয়ে বুলিয়ে পরখ করেছে তার ছেলেকে, তারপর জিগ্যেস করেছে—'কি কাজ তোর বলত, কি এত কাজ?'

'কাজ? কাজ আবার কি, এই ধরো যেমন কাল সকালে কতকগুলো পোস্টার দিতে হবে দেওয়ালে, কিছু কাগজ বিক্রি করতে হবে····।'

'আর?'

'আর? এই রকমেরই টুকিটাকি করতে হবে কিছু। কিন্তু কেন?'

'শুধু এই? শুধু এর জন্যে?'

মার অবিশ্বাসী চোখদুটো হতাশের মতো তাকিয়ে থেকেছে ওর সেদিনকার তাজা তরুণ চোখদুটোর দিকে -'কী হল এতে, কী হবে?'

'হবে, হবে নিশ্চয়। সবুর করো···'

ও হেসেছে স্বপ্নে, কে জানে কিসের স্বপ্ন।

কিন্তু জবাব দিতে পেরেছিল কি? না পারে নি, কারণ সময় এগিয়েছে আরো, আরো। একবছর, দুবছর, তিন বছর····দশ বছর, এগারো বছর—

হঠাৎ আবার এসে দাঁড়িয়েছে ওর মা। চুল পেকে গেছে—পেকে পেকে শাদা হয়ে গেছে বিছ্‌ছিরি রকমের। শ্লথ হয়ে এসেছে দেহ, চোখের দুপাশ দিয়ে কুঁচকে এসেছে মুখের চামড়া।

এত বয়স বেড়েছে ওর মার? এত বছর কেটে গেল কবে?

ওর মা তাকিয়ে থেকেছে ছেলের দিকে। তাকিয়ে তাকিয়ে তারপর হঠাৎ ফিস ফিস করে মন্তব্য করেছে আপন মনে, 'তোর বয়সও পেরিয়ে গেল দেখছি…'

ও চমকে উঠেছে, 'কার?'

'তোর। তোর শরীরও ভাঙছে…তুই-ও…'

ও অস্বস্তি বোধ করেছে এই ক্লান্তিহীন স্নেহপ্রবণ অথচ অবিশ্বাসী দৃষ্টিটার সামনে। ও পারছে না—এই অসহ্য দুর্বলতাটা যেন ধরা পড়ার উপক্রম হয়েছে। ঐ লোল চোখ দুটো যেন জিতে যেতে শুরু করেছে এতদিনে।

'কী এত খাটতে হয় তোকে, কী তোর এত কাজ?'

'কাজ? কাজ আব কি! এই কাল সকালে কয়েকটা পোস্টার আঁটতে হবে। তাছাড়া পাঁচটার শিপটে একটা গেট মিটিং! এই সব আর কি…'

ওর খেয়াল ছিল না যে দশ বারো বছব আগেও প্রায় একই রকম জবাব দিতে হয়েছিল ওকে।

'শুধু এই। এবই জন্যে? তাহলে কী হল?'

কী হল? ও চেয়েছিল বুঝিয়ে বলতে। প্রকাণ্ড বোঝা ঠেলে ঠেলে পাহাড়ে ওঠা। উঠতে যা বাকি আছে সেটার পরিমাণ এত বেশি যে যেটুকু ওঠা গেছে তা নজরেই পড়তে চায় না।

কিন্তু অবিশ্বাসী চোখ দুটোকে সে কথা বোঝানো যায়নি।

'কিন্তু তোর কী হল—'

'কার, আমার? আমার আবার কী হওয়াতে চাও?'

'কতো লোক ধন-সম্পত্তি করে, তা না হয় নাই বা করলি। কিন্তু মান প্রতিপত্তিও তো হয়। নাম-যশ? তুই কী করলি সারা জোয়ান কালটা খুইয়ে?'

ও চমকে উঠেছে। ও মার লোল চোখছুটোর দিকে তাকাতে পারেনি, কেননা কে জানে হয়ত সেখানে ছায়া পড়েছে ওর নিজের পিঠ-কুঁজো যৌবন-খোয়ানো রিক্ত মূর্তিটার। চমকে উঠেছে, তারপর বলেছে, 'সবুর করো—সবুর করে ছাখো—' তারপর হেসেছে ক্লান্তিতে টেনে টেনে, আর স্বপ্নে। কিসের স্বপ্ন কে জানে!

আর তারপর সে এখন মরছে। বুড়ী সবুর করতে পারলেও সে নিজে আর সবুর করতে পারেনি।

অকালেই মরছে, তবু সোরগোল তোলা মৃত্যু এ নয়। সে রকম মৃত্যু সকলের হবেই তা নয়। অনেককে মরতে হয় একটা পরিপূর্ণতার পরে, অনেককে মরতে হয় রক্তের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে, উত্তেজনার মধ্যে, ঘোষণাপত্রের মধ্যে। ওর তা হয়নি। যেটুকু সামর্থ্য ছিল সেটুকু নিঃশেষে খরচ করে ফেলার পর মৃত্যু। মামুলী, উত্তেজনাহীনঃ প্রায় অলক্ষ্য। এ মৃত্যুর জন্যে ওকে আলাদা করে চেনার প্রয়োজন হবে না।

আর এই মৃত্যুর পূর্বে শুধু একটি জিনিসকে সে ভয় করেছিল—তার মা। আরো বুড়ো, আরো লোল এক জোড়া স্নেহার্ত দৃষ্টি কাঁপতে থাকবে তার মুখের ওপর। আর কাঁপতে থাকবে একটা প্রশ্ন '—কী হল, শেষ পর্যন্ত কী পেলি তুই ?—' এ ও চায়নি।

তবু সে এসেছে; এসেছে ছেলের মৃত্যুশয্যার কাছে। এবং ফিস ফিস করে কথা বলছে ওর আশেপাশের লোকদের সঙ্গে—'কী এত খাটতে হত ওকে ? কী এত কাজ তোমাদের ?'

ছুচার পয়সা চাঁদা তুলে যারা এই বিনা পয়সার রোগশয্যাটার পাশে মাঝে মাঝে এসে দাঁড়ায় তারা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করেছিল নিজেদের মধ্যে ; কাজ ? কাজ আর কি! এই হয়ত গেট মিটিং করা, কাগজ বিক্রি করা, প্রচার করা····এমনি নানা রকম···।'

'শুধু এই! শুধু এর জন্যে—ষোল বছর ধরে শুধু এরি জন্যে···'

বুড়ীর ফিসফিসে গলার স্বরটা ভেঙে পড়েছিল এক অসহ্য কান্নায়।

ওরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করেছিল নিজেদের মধ্যে, তারপর একজন মানুষ মরে গেলেও যে সব কাজ চলতে থাকবে, যে সব কাজ চালিয়ে যেতে হবে তার কথা বলেছিল এলোমেলো, ছাড়া ছাড়া।

আর তারপর শয্যার সারির সামনে দিয়ে খট খট করে হাঁটতে হাঁটতে একটা নার্স কি ভেবে ঘুরে দাঁড়াল, কিছুক্ষণ নাড়ীটা টিপে দেখলে অন্য আর একজনের সঙ্গে কথা কইতে কইতে। তারপর কোনও মন্তব্য না করেই চলে গেল আবার।

কোন এক রুগীর জন্য ইউরিন-বটল নিয়ে ফেরা জমাদার কি ভেবে বুড়ীর মুখের দিকে তাকিয়ে অকারণে সান্ত্বনা দিলে, 'না না এখনো জানটা আছে। যখন যাবে উ দেখনেসে মালুম হয়ে যাবে—'

তারপর দরজার আড়ালে বটলটা ধপ করে নামিয়ে রেখে কার সঙ্গে যেন বাঘবন্দী খেলতে শুরু করলে নিবিষ্ট মনে।

আর ওর মা ঝুঁকে এল ওর মুখের ওপর! প্রায় ফিসফিস করে প্রায় শোনা যায় না এমনিভাবে কাঁপতে লাগল তার শেষ প্রশ্নটা—'কী হল! কী পেলি তুই শেষ পর্যন্ত।'

তখন হঠাৎ চোখ মেলল ও। ওর ফাটা-ফাটা টান হয়ে বসা মুখখানার মধ্যে কটকটে সাদা একজোড়া চোখ তাকাল ঐ প্রশ্নটার দিকে, তাকাল একবার দরজার পাশ দিয়ে দেখা বাইরের আকাশটার দিকে। সন্ধ্যার হালকা অন্ধকারে সেখানে কয়েকটা মেঘ রঙ পালটাচ্ছে এখনো। তারপর ধীরে ধীরে, শেষ চেষ্টা করে—ধীরে ধীরে প্রথম—এই প্রথম পরিপূর্ণ জবাব দিল ঐ প্রশ্নটার—'আমি যে কমিউনিস্ট মা।'

আর প্রথম চমকে উঠল বুড়ীর অবিশ্বাসী লোল চোখ দুটো। ও চোখ বন্ধ করেছে আবার। আগের মতই একবার হাসতে চেষ্টা করেছিল বুঝি, হাসতে পারেনি।

তবু ওর না-হাসা ফাটাফাটা দুই ঠোঁট আর বুজে-আসা ক্যাসফেসে দুই চোখ অস্পষ্ট একটা স্বপ্নে কাঁপছে।

কিসের স্বপ্ন বুড়ী জানে! বুড়ী জানে!

হাসি

এ বেশ মজা তো !

গোকলা হিহি করে হাসে। হাসে হিন্দুস্থানী ঘুঁটেওয়ালী মেয়েটা। হাসে বস্তির সকলে। এ আচ্ছা ব্যাপার লাগিয়েছে বাপু।

গোকলা বলে, 'মাইরী, কারবারে দক্ষযজ্ঞ ! তোমার শিয়ালদহ হতে টেরামে উঠলাম আর নামলাম গিয়ে একেবারে বড়োবাজার ; ফের উঠলাম, নামলাম এসে তোমার চৌরঙ্গী ; ফের উঠলাম, শালা হরদম উঠছি·······শালা, কারবারে দক্ষযজ্ঞ।'

যতীন্দ্র কাজ করে দূরের একটা কারখানায়। যাবার সময় যায় ট্রামে, ফেরে হেঁটে ! গোকলার মতো অমন সারাদিন বিনি পয়সায় ট্রামে চেপে ঘোরার সময় তার কই। সারাদিন কাজে আটকে থাকতে হয় খুদে দেশী কারখানাটার বুকচাপা ঠাঁইটুকুর মধ্যে। ছুটির পর ক্লান্তভাবে আধাঘুমন্ত মানুষের মতো সে রোজ ফেরে ঢিমিয়ে ঢিমিয়ে। কিন্তু আজ সে এসেছে একেবারে উৎসাহে আটখান হয়ে। গোকলাকে থামিয়ে দিয়ে সে সবিস্তারে বলতে থাকে নিজের অভিজ্ঞতাটুকু—'কনডাকটর টিকিট-ই চাইলে না। একদম কাছে ঘেঁষলে না। দু একজনা তিন পয়সা বার করে দিলে, লাও, টিকিট দিবে তো ওই তিন পয়সা, চার পয়সা দিব না আমরা ! তো কনডাকটর ঘুরৎ দিলে, আমাদের কি, কোম্পানি বুঝবে···মাইরী !···'

যতীন্দ্রকে থামিয়ে দিয়ে, তার কথার মাঝখানেই আর একজন বলতে থাকে, তার নিজের কাহিনী। না বলে পারে না। নানা জনের

নানা অভিজ্ঞতা, যদিও কথাটা তার এক—ট্রামের বাড়তি ভাড়া দেয়া হবে না। পাবলিক বেঁকে বসেছে।

গোকলা বলে, 'চিটিংবাজি নেহি চলেগা। লাও, টিকিট বার করো, তিন পয়সা দিচ্ছি। আর নয়ত এমনি চললুম শালা মুফৎ-সে। মাইরী যতো ছোঁড়াগুলো সব জুটে গেছে। টেরামে ভিড় কি, উঠতে পারা যায় না……'

বলে হাসে।

হিন্দুস্থানী মেয়েটা ঘুঁটের ঝুড়ি মাথায় করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা শোনে। যায় না, ঘুঁটে হাঁক দিতে দিতে চলে যাওয়া তার দরকার, তবু যায় না। ট্রামে চাপা এমনিতেই তার বিশেষ ঘটে না। এই হুজুগটার মধ্যেও চাপেনি। তবু দাঁড়িয়ে থাকে, যে যা বলে তাই শোনে হাঁ করে। তারপর ছেঁড়া আঁচল মুখে চাপা দিয়ে হাসে খুক খুক করে, 'এ দেখো কলকাত্তাকা হাল্! কভি দেখা না শুনা।'

হাসে মন্তাও, তাজ্জব শহর সত্যিই। কলকাতায় এসে পড়া অবধি আইন আর শাসনের তাড়নার মধ্যে ঘুরে মরতে হয়েছে। ট্রেনে কিংবা ট্রামে উঠে কি ভাবে টিকিট ফাঁকি দিতে হবে তারই নতুন নতুন কায়দা তাকে আয়ত্ত করতে হয়েছে এতদিন। হঠাৎ ফাঁকির দারিদ্র্য এমন প্রকাশ্য দাবির সাহসে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াবে, দেখে ঠাহর পাচ্ছে না সে। শুধু হাসি পাচ্ছে খুব। যে যাই বলুক, যাই ঘটুক, দমকে দমকে হাসি আসছে তার। বলে, 'আজ বেটারা তাল পায়নি। কাল দেখিস কিছু একটা করবে। নইলে…।'

নইলে যে কি হবে তা মন্তা জানে না। চোখমুখ ফেটে হিহি হাসিতে সে এলিয়ে পড়তে চায়।

'হো-হো-হো—' গোকলা হাসে হেঁড়ে গলায়। বলে, 'চল মন্তা আর এক চক্কর ঘুরে আসি……'

'চল, মাইরী, এ এক আচ্ছা…'

গোকলার মা ঝিয়ের কাজ করে বাড়ি-বাড়ি। সান্‌কীতে করে কোথা থেকে যেন ভাত-তরকারি নিয়ে আসছিল ছেঁড়া আঁচলটা চাপা

দিয়ে। ওদের দেখে দূর থেকেই হাঁক দিতে শুরু করে, 'ওরে হতভাগা, ও গোকলা, ওরে ও আঁটকুড়ের······আবার চললি কোথায় হল্লা জমাতে? টেরামে মেরামে যাস না রে হতভাগা, পুলিস লাগাবে না কি করবে যে রে, শুনে এলাম বাবুদের ঠেঁয়ে···ওরে ও মুখপোড়ার ব্যাটা···।'

'পুলিস?' মস্তা কপট বিস্ময়ে বড়ো বড়ো করে চোখ দুটো।

'পুলিস?' গোকলা তার চোখ মুখ আরো বড়ো, আরো বিস্তারিত করে তোলে বেয়াড়া রকমের। তারপর হো হো করে হেসে ওঠে দুইজনেই।

'হো-হো-হো—'

'দূর, দূর হতভাগা কোথাকার। হাসছে দেখো মুখপোড়াগুলো···' দূর থেকেই গোকলার মা চটে গিয়ে গাল পাড়তে থাকে। তারপর গাল পাড়তে পাড়তে কোন সময় নিজেও হেসে ওঠে আপন মনে, 'তাই না বটে গো। কি লাগিয়ে দিলে সবাই, দ্যাখো এবার···'

আইন, অর্ডার। সাধারণ মানুষের মাথার ওপর চাপানো এই আদ্যিকালের অনড় রাজ্যের একটা সিদ্ধান্ত হঠাৎ চোখের সামনে এমন বিকল হয়ে যেতে পারে, কেউ ভাবেনি। আর কেন জানি হাসি আসছে সকলের, হাসি আসছে গরিব মানুষগুলোর।

কিন্তু ঠিকই শুনেছে গোকলার মা।

ট্রামে উঠতে গিয়ে দেখে মোড়ের মাথায় সেজেগুজে দাঁড়িয়ে আছে ঠিক। পানের দোকানের বেঞ্চি টেনে নিয়ে কয়েকটা বসেছে গ্যাঁট হয়ে।

গোকলা খানিকটা থমকে দাঁড়ায়। তারপর বলে, 'কি বাবা? লাঠি দিয়ে কিছু হবে না চাঁদু। এ একেবারে কারবারে দক্ষযজ্ঞ। তার চেয়ে ঘরে গিয়ে খৈনী ডলো গে বসে বসে। এ দিকে রংবাজী নেহি চলেগা—'

পুলিসগুলো সাধারণ লাঠিধারী। হাঙ্গামার মধ্যে যাবার বিশেষ কোনো ইচ্ছা তাদের আছে মনে হয় না। গোকলার টিপ্পনি শুনে চঞ্চল হয়ে ওঠে একটু। লোহার নালমারা জুতোর শব্দ তুলে এদিক

ওদিক নড়াচড়া করে খানিক। তারপর দার্শনিকের মতো একটা অন্যমনস্ক বৈরাগ্যের ভাব ফুটিয়ে ভালো মানুষের মতো চেয়ে থাকে সামনে।

আর ফিক ফিক করে হাসে মন্তা, হাসে ভিড়করা মানুষগুলো। কিছু না শুনে না বুঝেই হাসে ভিড়াক্রান্ত ট্রামের ঝুলন্ত প্যাসেঞ্জাররা।

আর তার মধ্যেই ভিড়ের ভেতর, ঠেলে ঠুলে ট্রামে ঢুকে পড়ে গোকুল। কিন্তু ঠিক বলেছিল গোকলার মা, ট্রামের মধ্যে শুধু গোকুল নয়, পরের স্টপ থেকে উঠল একদল কড়া পোশাকের পুলিস।

'এই খেয়েছে', গোকলা পাঁজরে খোঁচা মারে মন্তার।

মন্তা বলে, 'শালা! পুলিসগুলোই কন্‌ডাক্‌টর হয়ে গেল দেখছি—'। সত্যিই তাই। বেচারা কনডাক্‌টর যন্ত্রের মত দাঁড়িয়ে আছে; তার পাশে গিয়ে হুকুম চালাচ্ছে এক পুলিশ অফিসার; যারা চার পয়সা দিতে রাজী নয়, তাদের ঠেলে বার করে দিচ্ছে দরজার দিকে।

'চার পয়সা দেবে না? উতার যাও! উতার যাও—'

'তুমি? চার পয়সা দেবে না?'

'তুমি নয়, আপনি বলো শালা!'

'চার পয়সা দেবেন না?'

'না।'

'তোম?'

'নেহি।'

'উতার যাও।'

'কাহে উতরেঙ্গে?'

সারা ট্রাম ভর্তি উত্তেজনা। অপমানে ক্ষেপে উঠছে কেউ কেউ। দু একজন ভয়ে ভয়ে পয়সাও বার করে দিচ্ছে। হুড়মুড় করে নেমে যাচ্ছে অনেকে।

'তোম?' পুলিস অফিসারটা এসে দাঁড়ায় গোকলার কাছে।

গোকলা বোকার মতো চুপ করে থাকে প্রথমটা। তারপর তার কুৎসিত, বয়সের আন্দাজে পাকা দরকচা মারা মুখটাকে আরো কুৎসিৎ

করে প্রকাণ্ড এক হাঁ করে হেঁড়ে গলায় ইচ্ছাকৃত এক বিকৃত শব্দ করে, 'মা—আ—আ—'

আর হেসে ওঠে সকলে। হেসে ওঠে কাঠের পুতুলের মতো দাঁড়ানো কন্‌ডাক্‌টরটা পর্যন্ত। শুধু সহকারী ইনস্পেক্টরটা রেগে মুখ কালো করে এগুতে চায় ঐ অসভ্য ছোঁড়াটার দিকে—'রাস্কিয়ান! যত্তো সব রাস্কিয়ান এসে···'

কিন্তু ততক্ষণে চলন্ত গাড়ি থেকে নেমে পড়েছে গোকলা, নেমে পড়েছে মন্তা, আর ঠিক পরের ট্রামেই উঠে হি হি করে হেসেছে—'শালারা নামিয়ে দেবে! নামিয়ে দিবি তো দে। কতো নামাবি····'

মন্তা বলে, 'শালারা এটাতেও পুলিস দিয়েছে। আচ্ছা খচরামি লাগালো তো।'

গোকলা চ্যাঁচায়, 'শালা কারবারে দক্ষযজ্ঞ! ডাঁড়া এটাতেও একপক্কর লাগাই দেখ। ফুলে পাড়ার ছেলেকে তো চেননি···'

'মাইরী, এ আচ্ছা····'

কিন্তু মনে হচ্ছে ব্যাপার সুবিধের নয়।

সারাদিন শহরে কি ঘটছে তার পুরো খবর জানা হয়ে ওঠে না যতীন্দ্রের। সে থাকে তার কারখানার চাপা দেওয়ালগুলোর মধ্যে আটকা। তবু যতটুকু তার নিজের অভিজ্ঞতা, রোজ ফিরে সেইটুকুই সে সবিস্তারে বলতে চায় গোকলা, মন্তা এবং আরো অনেকের চমকপ্রদ খবরের সঙ্গে সঙ্গে। সেই যতীন্দ্রও মাথা নাড়ে, 'না ব্যাটারা খচরামি লাগিয়েছে খুব। তোরা ঘুরছিস সারাদিন, মিটিনে গিয়েছিলি? মিটিনে কি ঠিক হলো জানতে হবে না?'

'মিটিন্? না মিটিনে কেউ যায়নি।'

'তবে, কারখানার ছোঁড়াঁগুলো খুব গরম হয়ে যাচ্ছে। শালা খচরামি লাগিয়েছে দেখো। কিন্তু মিটিনে কি হল···'

কিন্তু মিটিনে যাই হোক, তার জন্যে সবুর করতে আর গোকলার মা রাজী নয়। সে আসে একেবারে মারমুখো হয়ে, 'হতভাগার ব্যাটা।

মরবি, মরবি। সারাদিন ঘরের দিকে মাড়ালি না একেবারে ? গিলতে হবে না ? হায় হায়গো, ঢাকা ভাতটা ইঁদুরে নষ্ট করে ফেলালো যে রে…'

ভাত ? ও হো সত্যিই ভীষণ খিদে পেয়েছে গোকলার। মন্তাকেও সে টেনে নিয়ে যায়, 'লে আমাদের এখানেই খেয়ে লে। মা, মন্তাকেও চারটি দে—'

বুড়ি গাল দেয়, বকে, আর মাঝে মাঝে হাঁ করে শোনে গোকলার কথা। মন্তা বলে, 'ও সেই পুলিসটা! গোকলা যা একখানা হাঁ করেছিল। টেরামের লোক সুদ্ধ হেসে খুন।'

গল্পটা শুনে বকতে বকতেও হেসে ফেলে গোকলার মা, 'ও না বাবু, এ ছোঁড়াগুলো যে কি লাগিয়েছে….'বলে আরো এক হাতা করে ভাত দেয় ওদের পাতে।

'ওই মা তুই খেলি নি ?' গোকলা জিজ্ঞেস করে বিব্রতের মতো।

'আমি খেলে তোরা গিলবি কি ?' বলে মুখ ঝামটা দেয় গোকলার মা। তারপর উদাস আর খানিকটা কান্না-মেশা বিলাপের সুরে বলে, 'মার লেগে তো খুব দরদ। একটা কাজ কর্ম দেখে ছুটো টাকা রোজ-গার করলেও তো বুঝতাম ; এত বড়ো ছোঁড়া একটা কাজ জোটাতে পারলি না রে, ছি-ছি…'

'কাজ ?' গোকলা হাসে বেয়াড়াব মতো, 'কাজ কোথা, যতীন্দ্রকে শুধিয়ে দেখো না, কি বলে—'

'মর মর মুখপোড়া হাসছে দেখো—' এঁটো কাড়তে কাড়তে আবার বকতে শুরু করে গোকলার মা।

কিন্তু ওদিকে নতুন করে মজা লেগে গেল আবার।

ছুদিন কি-হবে কি-হবে করতে করতে হঠাৎ একটা কথা রটে গেল যেন আপনা থেকেই—বয়কট্। ট্রামে উঠলে যদি পুলিস দিয়ে চার পয়সা আদায় করতে চায়, তবে ট্রামেই উঠবে না আর।

'এ আচ্ছা বুদ্ধি বার করেছে মাইরী—' মন্তা হাসে খুক খুক করে, 'লাও শালা টেরামেই উঠবো না—'

গোকলা চ্যাচাঁয়, 'শালা কারবারে দক্ষযজ্ঞ! কেউ ট্রামে উঠবেন না। আপনারা কেউ না—'

রাস্তায় জমে ওঠা ভিড়টা চিৎকার করতে থাকে, 'বয়কট, বিলাতি ট্রাম কোম্পানি বয়কট—'

মোড়ের পুলিস দলটা থেকে রুল হাতে ছুটে আসে একটা সার্জেন্ট। 'পালা—পালা' করতে করতে খপ করে ধরে ফেলল একেবারে গোকলাকে। ধরলো আরো অনেককে। মন্তাকে ধরতে পারে না। সেই আনন্দে ছুটে গিয়ে সে হাসে হি-হি করে। তারপর থতমত খেয়ে যায়, 'ওই! শালারা করছে কি?'

থতমত খেয়ে যায় গোকলাও। ধরা পড়ে ওর কুৎসিত চৌকো মুখটা একেবারে বোকার মতো নীরেট দেখাচ্ছে। আরো যারা ধরা পড়েছে, তাদের সঙ্গে গোকলাকেও টেনে তুলছে প্রিজন-ভ্যানের মধ্যে। মন্তা দূর থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে, তারপর আপন মনে চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে বাড়ি ফেরে—'কেউ ট্রামে উঠবে না! শালারা খুব খচরামি লাগিয়েছে, কেউ ট্রামে উঠবে না—'

রাত্রে যতীন্দ্র ফিরে এসে মুখখিস্তি করে বলে, 'শালা খুব হয়ে গেল একচোট আজ কারখানার মধ্যে। সিধা কথা। শালা ভেড়ুয়ার দল। কারখানার মধ্যে লাগানি ভজানি। ক্যানে রাস্তায় কি হচ্ছে দেখতে পাচ্ছিস না? না কি সেন কোম্পানির পেট মোটা করবার জন্যে লেদ চালাবি সারাদিন? খুব একচোট হয়ে গেল আজ। সকলে বলে দিয়েছে হরতাল হয়ে যাক একদিন। এইবার শালা দেখব তোমার টেরাম কোম্পানি কোথায় যায়। কিন্তু তোরা কেউ মিটিনে গিয়েছিলি? কি হল মিটিনে জানলে হোতো....'

আর আরো গভীর রাত্রে বস্তির আঁকাবাঁকা গলিটা দিয়ে গাল দিতে দিতে গেল গোকলার মা, 'ওরে ও মুখপোড়া, সকলে ঘরে ফিরল তুই কোথায় হল্লা জমাচ্ছিস রে হতভাগা, ওরে ও আঁটকুড়ো....'

কিন্তু চার পাঁচ দিন পরে হতভাগা আবার এসে হাজির হাসতে হাসতে। বলে, 'শালা কারবারে দক্ষযজ্ঞ। ভাবলুম শালারা জেল

দিবে না কি করবে। শোর-বোঝাই করার মতো শালারা তো পুরলো নিয়ে লালবাজারে। তা আজ কোর্টে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিলে। বাইরে থেকে পাবলিকরা সব উকিল দিয়েছে কিনা। তারাই জামিন হয়ে যাচ্ছে। শালারা খুব ঠকেছে এবার…'

'শালা কারবারে দক্ষযজ্ঞ লাগাও এবার—' হো হো করে হাসতে হাসতে মন্তা চিৎকার করে ওঠে উল্লাসে, গোকলার বুলিটাকে নকল করে, 'এ আচ্ছা ব্যাপার হয়ে গেল মাইরী—'

'লাগাও এবার। এ বাবা পাবলিক রায় দিয়ে দিয়েছে, কাল হরতাল—' বলে যতীন্দ্র, রাত্রে এসে। গল্প জমে ওঠে নতুন নতুন। 'শালা এক ব্যাটা টেরামে উঠছিল আজ। বেশ ভদ্দর লোকের মত সাজগোজ। তো সকলে বল্লে যে স্পাই। তো যেই উঠেছে অমনি পিচ্!…মাইরী একেবারে তাক করে পানের পিক এমন ঝাড়লে একজন হো-হো-হো—'

'মাইরী একটা মিছিল হয়েছিল দেখেছিলি। ও কংগ্রেসী মিছিল শালা তার পিছনে কোথা থেকে জুটে গেছে তোমার হাজার হাজার লোক। শালারা পালাল বেগতিক দেখে। মাইরী…'

যতীন্দ্র কারখানা থেকে জোগাড় করে আনা একটা খবরের কাগজ খুলে 'দেখ শালা কি রকম দিয়েছে একখানা—' বলে, দেখায় একটা ব্যঙ্গ-চিত্র। অচল ট্রাম গাড়িকে টেনে নেবার জন্য গরুর মতো জুতে দেয়া হয়েছে মন্ত্রীকে।

'ও হো-হো-হো—একেবারে—হো-হো— একেবারে বলদ বানিয়ে হা-হা-হা—'

'হো-হো-হো—'

হাসি যেন বাঁধ ভেঙ্গে বেরতে চায় সারা দিন। এক মজার খেলায় একপক্ষ বেতালা দান ফেলে হারছে মাতালের মতো,—অন্যপক্ষ জিতছে অনায়াসে, ফুর্তির মেজাজে।

'হো-হো-হো-হো—'

ফাঁকা হরতালী রাস্তায় বোকার মতো পুলিস-গাড়িগুলোর ধড়ফড়ানি দেখে না হেসে পারে কেউ। না হেসে পারে ট্রেনের লাইনে গাদা গাদা মানুষের সামনে অচল নিরীহ ইঞ্জিনটাকে দেখে।

'মর হতভাগা, কি চেহারা হয়েছে দেখেছিস একবার আয়নায়', গোকলার মা গাল দিতে দিতে তেড়ে আসে গোকলার দিকে। আর গোকলা তাকায় মন্তার দিকে। হায়রে বাপ্। সত্যিই কেমন সর্বনাশা চেহারা হয়েছে মন্তার। আর মন্তা তাকায় গোকলার দিকে, মাইরী! কেমন ক্ষুধার্ত ভয়ংকর একটা ভাব কোন সময় ফুটে উঠতে শুরু করেছে গোকুলের বদখদ শরীরখানা ঘিরে।

আর তারপর হেসে ওঠে দুজনে, 'মাইরী, এ শালা আচ্ছা...'

আর তারপর চিৎকার করে, 'ট্রাই লাগ্! শালা কারবারে দক্ষযজ্ঞ!'

তারপর গিয়ে জোটে মোড়ের দঙ্গলটার কাছে। সারাদিন হৈ-হৈ করে ঘুরে মিছিল করে ফেরার সময় লাঠি খেয়ে ওরা গিয়ে জুটেছে মোড়ের কাছে। রাস্তা বাঁধছে সেখানে। গান গাইছে, বাঙলা গান, হিন্দী গান, সিনেমার গান, আর হল্লা করছে—'শালারা ছুলে পাড়ার সঙ্গে লাগতে এসেছো! দাঁড়াও–'

কারখানার হাতিয়ার ধরা হাতে যতীন্দ্র কট্ কট্ করে কাটছে কোথা থেকে জোগাড় করে আনা কাঁটা-তার। পাছা উঁচু করা কয়েকটা ঠেলাগাড়ি বেঁধে বেঁধে তৈরি হচ্ছে ব্যারিকেড। আর কয়েকটা ছোঁড়া সাঁই সাঁই করে ঢিল ছুঁড়ে অব্যর্থ লক্ষ্যে ফাটিয়ে দিচ্ছে রাস্তার বাল্ব-গুলো। 'দাঁড়া একটা মজা করি—' বলে কয়েকজন কর্পোরেশনের একটা পীচের গাড়ি নিয়ে এসে তাতে ধরিয়ে দেয় আগুন। কোত্থেকে একটা টিনের নল নিয়ে এসে কয়েকটা ছোঁড়া সেটাকে ব্যারিকেডের ওপর বসায় মেশিন গানের মতো করে, আর রগড়ে ফুর্তিতে হাসে হো-হো করে।

হঠাৎ দেখা যায় বন্দুক উঁচিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে গাড়ি ভর্তি পুলিস। বন্দুক উঁচিয়েই দূর থেকে তারা ফায়ার করে।

'পালা! পালা!' করতে করতে ছোটে সবাই। তারপর ছোটা থামিয়ে হেসে ওঠে গোকুল—'দূর শালারা ছুটছিস ক্যানে, ফাঁকা—শালা শুধু টিয়ার গ্যাস।'

টিয়ার গ্যাস! হো-হো করে হাসতে হাসতে আবার ঘুরে দাঁড়ায় কয়েকজন। টিয়ার গ্যাসের জ্বলন্ত শেলগুলো কায়দা করে ধরে আবার ছুঁড়ে মারে পুলিস গাড়িটার দিকেই। পুলিস গাড়িটা পেছিয়ে যায় ভয়ে। তারপর আবার বন্দুক উঁচু করে।

'পালা, পালা, এবার গুলি করছে শালারা—'

পালাতে পালাতে খুক খুক করে হাসে গোকুল—'এ শালা আচ্ছা ইয়ে হল তো। পায়ে পায়ে জড়িয়ে যাচ্ছে কেবল…'

পালাতে পালাতে হাসে মন্তা, 'ওই শালা, পা জড়িয়ে যাচ্ছে কি রে—' বলে ঘুরে দাঁড়িয়ে হঠাৎ চিৎকার করে ওঠে মন্তা—'রক্ত! রক্ত!'

জ্বলন্ত পীচের গাড়িটার দপদপে আলোয় দেখা যাচ্ছিল, রাস্তার ওপর নেতিয়ে পড়েছে গোকুল। নিজের শরীরের লাল রক্ত-স্রোতটাকে হাত দিয়ে চাপার চেষ্টা করছে মাঝে মাঝে। আর মাঝে মাঝে রক্তাক্ত হাতটা চোখের কাছে এনে দেখছে হতভম্বের মতো।

রক্ত! রক্ত!

চিৎকার করে উঠেই হঠাৎ স্তব্ধ ভাবে থমকে দাঁড়াল মন্তা। থমকে দাঁড়াল কলকাতা। রক্তের মধ্যে নেতিয়ে পড়ে শেষ বারের মতো হাসবার চেষ্টা করছে গোকুল।

চেনা অচেনা

অনন্তদা তাঁর গাঁ ছেড়ে বড়ো বেশি বাইরে যাননি।

প্রথম যখন তাঁকে দেখেছিলাম সেটা ছিল তাঁর নিজেরই রাজ্য—অনন্তদার ভাষা অনুসারে "ভাগচাষী এলাকার তেরো নম্বরে।" বোঝা যায় আসল রঙটা ফরসাই ছিল, গ্রাম্য আকাশ আর রোদ্দুর আর বয়সের তাপে এখন তাতে পুরোনো পেতলের মতো একটা গাঢ়, কষা-কষা, প্রায় কালচে ছোপ লেগেছে। না কামানো কাঁচাপাকা দাড়ির জঞ্জালে সে মুখে অসাধারণত্ব কিছু নেই। সাধারণত খালি পা কখনো-সখনো নয়ত রবারের টায়ার কাটা বীভৎস একজোড়া চটি, কাঁধে ঝোলানো থলে, তা থেকে ময়লা গামছাটা বেরিয়ে আছে খানিকটা। শহরের রাস্তায় কেউ তাঁকে দেখলে চাষী যদি নাও ভাবে তবে বড়ো জোর এক পাঠশালার মাস্টার নয় জমিদারী সেরেস্তার মুনশী বলে মনে করবে।

কথা বললেও অন্য কিছু মনে হবার সম্ভাবনা কম। হাইস্কুলের থার্ড ক্লাস পর্যন্ত পড়েছিলেন কোনো সময়। তারপর রাজনৈতিক আন্দোলনের নেশায় স্কুলের পড়া আর এগোয়নি। গ্রামে গ্রামেই ঘুরেছেন। গ্রামে গ্রামেই থেকেছেন। মাঝে মাঝে গ্রামের বাইরে যখন যেতে হয়েছে সেটা একেবারেই অনিচ্ছাবশে। হয় রাজনৈতিক সভা-সমাবেশে তাঁকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে জোর করে, নয় আরো জোর করে পুলিশ তাঁকে চালান দিয়েছে তাঁর এলাকার বাইরে, জেলার বাইরে, সমাজজীবনের বাইরে—জেলখানায়। আসলে জেল আর নিজের

জেলা এর বাইরে পা বাড়াবার কোনো ঘটনা তাঁর বিশেষ ঘটেনি। অথবা বলা যেতে পারে, তিনিই তা ঘটতে দেননি। সাত শ কৃষকের র‍্যালী নিয়ে তিনি ইউনিয়নের পর ইউনিয়নে তেভাগার ধান কেটে তুলতে একটু ভয় পেতেন না, অথচ নিরুপদ্রব শহরে নিতান্ত নিরুপদ্রব কোনো কাজে যেতে বললেই তাঁর মুখ শুকিয়ে আসত।

ঘনিষ্ঠরা জানেন, লোকটা সামান্য নয়। ঘনিষ্ঠরাই শুধু বলতে পারেন, লোকটার মাথায় যে গুছি গুছি সাদা সাদা চুল দেখা যায় তা অকালে পাকা। কথা বলার সময় মুখটা যে মাঝে মাঝে অকারণে বেঁকে বেঁকে যায় বিচ্ছিরি ভাবে, সেটা আগে ছিল না। এক মফস্বল জেলের অপ্রচারিত ও ব্যবস্থাহীন কুঠরির মধ্যে পঁয়ষট্টি দিন অনশন ধর্মঘটের পরেই ওই রকম হয়ে গেছেন। আর ঘনিষ্ঠরাই শুধু বুঝবেন, লোকটা যখন এমন কি পারিবারিক সাধারণ কথাবার্তার মধ্যেই অনবরত 'ডিশি কেন্দ্র' 'হাট-প্রচার' কিষক-র‍্যালী' 'পাঁচ নম্বর, তের নম্বর, এগারো নম্বর' প্রভৃতি শব্দ নিতান্ত ঘরোয়াভাবে ব্যবহার করে যায়, তখন তার মানেটা কি। অথচ নিজের জেলা ছাড়া অন্য কোথাও, বিশেষ করে শহরে বুদ্ধিমান বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে অনন্তদার অবস্থা হত প্রায় ডাঙ্গায় তোলা মাছ।

সেই অনন্তদাকে প্রায় জোর করেই এবারও টেনে আনা হল গ্রামের বাইরে। প্রতিনিধি হয়ে তাঁকে যেতে হবে শুধু আমাদের শহর পর্যন্ত নয়, শুধু কলকাতা পর্যন্ত নয়—একেবারে দেড় হাজার মাইল দূরে, দক্ষিণ ভারতের এক অপরিচিত জনপদে।

আমাদের বয়স কজনের অল্প। বিয়ে, শ্রাদ্ধ, সম্মেলন, সমাবেশে আমরা সহজেই খুশী হয়ে উঠতে পারি। তাতে দেড় হাজার মাইল লম্বা পাড়ি। হৈ হৈ করে আমরা জনকয়েক বেঞ্চি দখল করছি, হাঁকাহাঁকি করে ডেকে আনছি সঙ্গীদের। অকারণে হাসছি, চ্যাচাচ্ছি। শুধু এর মধ্যে মুখ গোমড়া করে একপাশে বসে রইলেন অনন্তদা।

'কি অনন্তদা, কি হয়েছে আপনার?'

'দুর দুর! কেনে আর হুদিন পরে গেলে হতনি? উদিকে হাটপ্রচারটা হয়ে রইছে—'

বললাম, 'রেখে দাও তোমার হাট-প্রচার। এখন সম্মেলন। সারা ভারতবর্ষ থেকে কত লোক আসবে, আর তুমি—'

'না ভাই কতো কাজ ছিল তমরা তো বুঝবেনি!'

কি কাজ ছিল, জেরা করতে শোনা গেল ১৪ তারিখ উচ্ছেদের মিটিং, থাকাই দরকার, ১৫ তারিখ ভাগচাষ বোর্ডে দরখাস্ত পেশ করার কথা, অনন্তদা ছাড়া কে আর সে দরখাস্ত লিখবে? আর ১৬ তারিখ···১৬ তারিখ কি তা অনন্তদা কিছুতেই বলবেন না। বহু কসরৎ করে শেষ পর্যন্ত বেরুল—১৬ তারিখ তার মিটিং থেকে মাইল তিরিশ দূরে তেরো নম্বরের ধানগাছিয়া গ্রামের ভাগচাষী কৈলাস হুলুই-এর ছেলের মুখে ভাত, লোকটা বার বার করে বলেছিল হে।

আমি হো হো করে হেসে উঠলাম। কামরার সকলে হেসে উঠল হো হো করে। অকারণে কে চিৎকার করে কি একটা বলতে শুরু করলে বোঝা গেল না। তারপর চলন্ত ট্রেনের জানালা দিয়ে বুদ্ধি করে কে একটা লালঝাণ্ডা বার করে দিলে। দেড় হাজার মাইল পাড়ি জমালাম আমরা। প্রাথমিক মন খারাপ আর অস্বস্তির পর কামরার মধ্যে অনন্তদাও ভিড়ে গেলেন আমাদের সঙ্গে।

আর এই হৈ হল্লার মধ্যে আবিষ্কার করলাম, অনন্তদা গান জানেন একটা। মাত্র একটি গান—দশবারো বছর আগে শখ করে শিখেছিলেন, শখ করে চাষীদের শিখিয়েছিলেন। আমাদের পাল্লায় পড়ে সেই একটি গানকেই অনন্তদা গাইলেন অন্তত বার পাঁচেক—চাষী তোর লাল সালাম তোর লাল নিশানে···

বুড়োটে অনভ্যস্ত ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলা ও গানটা কেমন পুরনো অধুনা খানিকটা অপ্রচলিত। তবু তা গাইবার সময় হঠাৎ এমন একটা দম হারিয়ে যাওয়া অতিরিক্ত আবেগ জেগে ওঠে অনন্তদার গলায়, এমন একটা আত্মভোলা আনাড়ী ভাঙ্গা-ভাঙ্গা শব্দ বেরয় তাঁর সুরে যে ইচ্ছে করলে আমরা হাসতেও পারতাম।

কিন্তু তখন না হাসলেও হাসতে হল গন্তব্য স্থলে গিয়ে।

ট্রেনের জানালার বাইরে আবহাওয়া বদলিয়ে গেছে কোন সময়, বদলিয়ে গেছে বাইরের দৃশ্য, স্টেশনের মানুষগুলোর চেহারা, ভাষা। নেমে বোঝা গেল কতোখানি বদলিয়েছে। হিন্দীও বোঝে না কেউ। ভদ্রলোক ছাড়া ইংরেজীও কেউ বিশেষ জানে না। কথা বলতে হলে ভাঙ্গা হিন্দী, ভাঙ্গা ইংরেজী এবং অনেকখানি অঙ্গ-ভঙ্গির আশ্রয় নেওয়া ছাড়া গতি নেই। তাতেও যে ফললাভ ঘটবে এমন নিশ্চিতি পাওয়া কঠিন। ব্যাপারটা আমাদের কাছে অবশ্য হিসেবে দেখা দেয়নি। কেননা প্রয়োজনীয় কাজ চালাবার জন্য ইংরেজী আমাদের সহায় ছিল এবং সম্মেলন বলে আগে থেকেই যে ব্যবস্থা হয়েছিল তাতে ইংরেজী বোঝার মতো লোকের অভাব ঘটেনি।

সুতরাং এই অপরিচিত দেশ এবং অলঙ্ঘনীয় ভাষার এলাকায় ইংরেজী জানা আমাদের যেটুকু ধাক্কা পেতে হয়েছিল সেটা বরং উপভোগ্যই মনে হযেছিল। সারাদিন ধরে এই ধরনের টুকিটাকি টক্করের অভিজ্ঞতা নিযে সন্ধ্যাবেলা যখন যথাবিহিত ক্যাম্পে আশ্রয় পাওযা গেল—তখন সম্মেলন সংক্রান্ত কাজের কথা ছাড়া আর যেটুকু কথা হল তা সবই উপভোগের রসে ভরা। এইটুকু সমযের মধ্যেই কে কতরকম ভাবে ভুল বুঝেছে, এবং ভুল বুঝিযেছে দেখা গেল তার ফিরিস্তিটা আশ্চর্য রকমের বিচিত্র। খাওযা দাওয়ার পর এ বিচিত্র কাহিনীর হালকা গল্পটা বেশ জমে উঠেছিল, হঠাৎ নজরে পড়ল—এক কোণে দেয়ালে ঠেস দিযে বিরস মুখে বসে আছেন অনন্তদা। তাঁর ট্রেনের পোশাকটা পর্যন্ত ছাড়েননি। সেই মালকোচা মারা চুয়াল্লিশ ইঞ্চি ধুতি। সম্মেলনে আসছেন বলেই বোধ হয় পা দুখানার জন্যে কোনো-রকমে জোগাড় করে এনেছেন একজোড়া নতুন কেডস্! দুই কাঁধে ঝোলানো ফিতে বাঁধা দুই থলি। সব কিছু সমেত অনন্তদা বসেছেন উঁচু হয়ে অস্বস্তি ভরে, যেন এখুনি কোথাও আবার ফিরে যেতে হবে তাঁকে।

জিজ্ঞেস করলাম, 'কি অনন্তদা, কি হল আপনার?'

অনন্তদা বিরক্তভাবে তাকালেন আমাদের দিকে তার পর মুখ ঘুরিয়ে বিমর্ষভাবে জানালেন, 'না কি আর হবে……..'

আমরা নাছোড়বান্দা। ঝাঁক বেঁধে পাল্টা প্রশ্ন আসতে দেরি হল না একটুও! কিছু হয়নি তো অমন করে আছেন কেন? আহা জুতোটা নয় খুললেনই একটু। দিন, দিন, থলে দুটো ঘরে রেখে আসি। আহা অনন্তদা বলুন না, কি হয়েছে। শত কণ্ঠে এমনি শত প্রশ্ন।

শেষ পর্যন্ত স্বীকারোক্তি করতে হল অনন্তদাকে, 'না বাবু, ই তমাদের পাল্লায় পড়ে এসে ভালো করলামনি। তমরা তো ইঞ্জিরি-মেঞ্জিরি বলে পেরিয়ে যেতেছ। কিন্তু ই একটা কথা বুঝছি না হে। বাপের জন্মে বাবু দেখিনিক ই সব…… '

আর তখন আর একবার আমাদের হো হো করে হেসে ওঠার কথা! কিন্তু অনন্তদার মুখের ওপর যে অকৃত্রিম বিরক্তি আর অসহায়তাটা ফুটে উঠেছিল, তা দেখে আমরা অনেকেই হাসলাম না।

অনন্তদার মতো লোকের কাছে ব্যাপারটা সত্যিই হাসির নয়। গ্রামের বাইরে যে অনন্তদা কখনো পা বাড়ায়নি, নিজের ভাগচাষী এলাকার এগার নম্বর না বারো নম্বর ইউনিয়নের প্রচলিত গ্রাম্য বাঙলা ছাড়া যিনি কদাচ অন্য ভাষার কথা স্বপ্নেও ভাবেননি, নিচু ক্লাশে শেখা ইংরেজী যিনি দীর্ঘদিন আগে অনায়াসেই ভুলে যেতে পেরেছেন, তাঁর পক্ষে যে এই অপরিচিত ভাষার রাজ্যটা ভয়াবহই ঠেকবে, তাতে সন্দেহ কি।

সান্ত্বনা দিয়েছিলাম, 'আপনার অসুবিধা হবে না অনন্তদা। আমরা আছি দরকার হলে ইংরেজীর কল্যাণে আপনার দোভাষীগিরি করে দেওয়া যাবে।'

কিন্তু বিরক্তি অনন্তদার কমল না।

'কিন্তু নিজে কথা না কয়ে পারা যায় কখুনো? ধুর তারি তমাদের পাল্লায় পড়ে খামকা…'

অনন্তদা নতুন করে ফিরিস্তি দিতে শুরু করলেন, হাতে তাঁর কত কাজ বাকি পড়ে আছে। আর কদিন বাদে ধান কাটা শুরু হবে। ভাগচাষীদেরকে দু এক কথা বলতে তো হবে কি হাঁ এই করো, জোতদাররা এই মতলব ভাঁজছে। এই করলে সুবিধা হবে। ইত্যাদি।

শুধু সম্মেলনের সময়টা অনন্তদা থাকতেন কান খাড়া করে। উদ্বিগ্ন সতর্কতার সঙ্গে অনুসরণ করতেন বক্তাদের প্রত্যেকটি শব্দ—ঝানু কৃষক যেভাবে আদালতে তার পক্ষের উকিলের বক্তৃতা বোঝার চেষ্টা করে প্রায় সেই ভাবে। আমাদের মতো ইংরেজী জানা অর্বাচীনদের প্রয়োজন হত শুধু সেই সময়টুকু,—তাঁকে বোঝানোর জন্য এবং তাঁর বুঝটুকু অন্যত্র পেশ করার জন্য। কিন্তু তার পরেই বেঁকে বসতেন তিনি। 'ই কথায় লিয়ে এলে বাবু তমরা…'

সম্মেলনের অধিবেশনের মাঝে মাঝে অবসর পেলেই আমরা কেউ ছুটতাম শহরটাকে আগা গোড়া দেখে নেবার জন্যে। আর যাই হোক দর্শনীয় জিনিসের অভাব নেই। প্রাচীন রাজপ্রাসাদ, রহস্যজনক ভাস্কর্য, সহস্র মূর্তি খচিত উত্তুঙ্গ গোপুরম এবং অবশ্যই দোকানপাট সাজসজ্জা বাতি বিদ্যুতে শোভিত নগর-কেন্দ্র।

যদি বলতাম, 'চলুন অনন্তদা আজ থিরুমল নায়েকের রাজবাড়ি দেখে আসি—'

অনন্তদা নির্ঘাৎ জবাব দিতেন 'তমরা যাও বাপু তমরা ইঞ্জিরি মিঞ্জিরি বলতে পারবে। আমাকে কেনে….'

এক আধবার অনন্তদাকে নিয়ে হোটেল বাজার যাবার চেষ্টা করেছি কিন্তু ফল শুভ হয়নি। আরো মুখ গোমড়া করে অনন্তদা কোণ নিয়েছেন রাত্রে!

সম্মেলনের কাজের কথা ছাড়া ক্যাম্পে অন্য কথার আসর যখন বসত, তখন মহাউৎসাহে আমরা কয়েকজন আলোচনা করতাম—মন্দিরটা কতো পুরনো, এর ভাস্কর্যের বৈশিষ্ট্যটা কি, আমাদের থেকে এদের সমাজটা কতখানি তফাৎ, ইত্যাদি সে আলোচনায় অনন্তদাকে পাওয়া যেত না। হয় তিনি তখন তাঁর ক্যাম্বিসের ব্যাগ থেকে বার

করে সুলভ অনুবাদের কোনো বাঙলা রাজনীতির বই পড়তেন মনোযোগ দিয়ে, নয় ভোঁতা একটা পেনসিল দিয়ে দারুণ মনোযোগে কি সব নোট করতেন এমন একটা খাতায়, বহু ব্যবহারে যার কোণ গুলো দুমড়িয়ে এসেছে বহুকাল আগেই।

এ হেন অনন্তদা একদিন শোবার আগে অন্যমনস্কভাবে এসে বসলেন আমার বিছানায়, 'আচ্ছা তমরা তো সবদিক ঘুরে বেড়াতেছ। তা উদিকটায় কি আছে বলো দেখি ?'

'কোন দিকটা ?'

ঘর থেকে বেরিয়ে ডানদিকে সোজা গিয়ে তারপর গলি দিয়ে ঘুরে ডান দিক না বাঁদিকের পথ ধরে কোন কল্পিত দিকটার কথা যে অনন্তদা বোঝাবার চেষ্টা করলেন, তা হাজার চেষ্টাতেও ঠাহর করতে পারলাম না। বললাম, 'না অনন্তদা বুঝতে পারছি না। কিন্তু কেন ?'

'না তাই জিজ্ঞাস করছিলাম আর কি—' বলে অনন্তদা চলে গেলেন বিছানায়। বুঝলাম, তাঁর প্রয়োজনীয় জবাবটা দিতে পারিনি বলে তিনি খুশী হননি।

হঠাৎ এরকম ঔৎসুক্য অনন্তদার কেন, সেদিন বোঝা না গেলেও বোঝা গেল পরের দিন। খাওয়া দাওয়ার পর আবার এলেন অনন্তদা, 'আচ্ছা উই দিকে কি একটা পাড়া আছে ; উর জমিদারটা কুন দিকে থাকে বলতে পার ? একবার দেখতাম....'

প্রথমত কোন পাঁড়া তা বোঝার উপায় নেই। দ্বিতীয়ত, সেখানে লোক বাস করলেই যে জমিদার কেউ আছে তাও হলপ করে বলা মুশকিল। কিন্তু দেখা গেল অনন্তদা একেবারে নিশ্চিত—জমিদার কেউ আছে। এবং তারা তাঁর ভাগচাষী এলাকার ১১নং না ১৩নং এর ঈশ্বর দিলদার মতো অবশ্যই একজন অত্যাচারী লোক। ঐ পাড়ার লোকেদের ওপর নিশ্চয়ই ভীষণ জুলুম করে। লোকগুলোকে কোনো একটা বুদ্ধি জুগিয়ে দিতে পারলেই তারাও জমিদারকে বিপদে ফেলতে পারবে অনায়াসে।

শেষপর্যন্ত জিজ্ঞেসাই করতে হল, 'কিন্তু এত খোঁজ তোমার কেন একটু খুলে বলতো—'

অনন্তদা তার কোঁচকানো কালো চোখ দুটো দিয়ে আমার মুখের ভাব পরখ করলেন সতর্কভাবে। তারপর বোধহয় খানিকটা আশ্বস্ত বোধ করে জানালেন, ঐ পাড়ায় নাকি একটা ছেলে আছে। নিশ্চয়ই ছেলেটার খুব কষ্ট। নিশ্চয়ই ওদের ঘরে খানপান বিশেষ নেই। অথচ ছেলেটা নাকি দারুন ভালো ছেলে। ভারি বুদ্ধিমান—সব বোঝে। অনন্তদাকে চিনতে পেরেছে ঠিক। কুমরেট কুমরেট বলে অনন্তদাকে সেলাম দিয়েছে। এখানে কাজকর্মের নিশ্চয়ই কোনো সুবিধা হচ্ছে না ছেলেটার। লেখাপড়ারও না। আচ্ছা ওকে অনন্তদার ভাগচাষী এলাকায় ১০নং কিংবা ১১নং এ নিয়ে গেলে কেমন হয়? দুটো খেতে তো পাবেই, তাছাড়া সমিতি থেকে…

অবাক লাগল। ভেবেছিলাম অনন্তদা যখন আমাদের সঙ্গে বেরোয় না তখন নিশ্চয়ই ঘরেই বসে থাকে একলা। বোঝা যাচ্ছে, তিনিও অবসর সময়ে এদিক ওদিক ঘোরার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তাঁর ১২নং না ১৩ নম্বরের খাঁটি গ্রাম্য বাঙলা সম্বল করে এত খবর তিনি যোগাড় করলেন কেমন করে?

সন্দেহ নেই যে অল্প একটু দেখার ওপর অনেকখানি আন্দাজ করে তিনি সন্তুষ্ট আছেন।

ইচ্ছে হয়েছিল একটু ঠাট্টা করি। কিন্তু কি ভেবে চুপ করে রইলাম।

কিন্তু হায় ভগবান! আমি চুপ করলেও অনন্তদার কল্পনাকে চুপ করাবে কে? আমরা কযেকজন যখন শহরের নানা দর্শনীয় জায়গা দেখে এসে সোৎসাহে গল্প জমাতাম তখন দিনকত অনন্তদাকে অসহায়ের মতো মুখ গোমড়া করে একলা একলা কাটাতে হয়েছিল। এবার যেন তার শোধ তুলতে লাগলেন অনন্তদা। আর কারো কাছে বোধহয় সাহস করতেন না। তাই রোজ রাতে শোবার আগে অনন্তদা এসে বসতেন আমার বিছানায়। খানিকটা আত্মমগ্নভাবে অনায়াসে গল্প করে যেতেন একনাগাড়ে।

সবই সেই অদৃষ্টপূর্ব ছেলেটার গল্প। অনন্তদার কথা মতো আমাকে বিশ্বাস করে যেতে হল, এই অপরিচিত শহরটায় কোন এক অপরিচিত

বাঁকে বাস করে এক দুঃখী কিন্তু বুদ্ধিমান ছেলে। ঘরে তার মা আছে কিন্তু খানপান কিছু নেই। জমিদাররা সব কেড়ে নিয়েছে—তাঁর এলাকায় যেমন ভাবে কেড়ে নিয়েছিল। ঐ ছেলেটার এক বড়ো ভাই ছিল। সে খুব খেপে গিয়েছিল একদিন। কেন খেপবে না? এত দুঃখকষ্ট অন্যায় অত্যাচার কেউ চুপ করে সইতে পারে? সেই ছেলেটা খেপে গিয়ে খুব আন্দোলন মিছিল লাগিয়েছিল। তো জমিদাররা একদিন পুলিস ডেকে নিয়ে এল। কেন মিছিল করছ? না আমরা স্বাধীনতা চাই, ঠিক ঠিক কিরষকের স্বাধীনতা। তো ওরা যুক্তি করে হঠাৎ গুলি চালাতে শুরু করল। ওহ্! বুড়ী মা-টার কি অবস্থা! ওই ছেলেটাই জোয়ান ছিল। খাটত খুটত, এখন বুড়ী মা-টাকে কাজে বেরতে হচ্ছে। ও-হ!

দৈনিক এ গল্প বাড়ত; নড়ত চড়ত। আজ যে কথা বলছেন অনন্তদা কাল বলার সময় তা একটু বদলে যেত, কিন্তু গল্প থামত না। আর অনন্তদার চোখমুখের দিকে তাকালে প্রতিবাদ করাও সহজ হত না। শুধু বারবার কিরষক বলাতে আপত্তি করেছিলাম—'কিরষক এ শহরে কোথায় পাবে অনন্তদা? হয়ত মজুর টজুর হবে?'

অনন্তদা একটুও বিব্রত না হয়ে সংশোধন করে নিতেন তাঁর কাহিনী, 'ও হ্যাঁ ওই মজুরই বটে....'

তারপর আবার অনায়াসে চালাতেন কিরষক বলে। অনায়াসে গল্পে যোগ হত নতুন কথা, নতুন ঘটনা।

ওই ছেলেটাকে আঁজ নাকি খুব দাবড়িয়েছে কারখানায়। কি করবে—ওইটুকু ছেলে কখনো খাটতে পারে অত ঘণ্টা। তবু খাটতে হবে। কিন্তু একটা কিছু করা যায় না? এত জুলুম করবে কেন গরিবের ওপর? আর ঐ মা টা—ওহ। এক ছেলে সেও মরল... ইত্যাদি।

শেষ পর্যন্ত? হ্যাঁ বিরক্তিকরই ঠেকতে লাগল ব্যাপারটা—বিশেষ করে অনন্তদার এই অনায়াস কল্পনার স্বাধীনতাটা।

সেদিনও অনন্তদা এসে বসেছিলেন রাত্রে। আমি বিছানায় টান

হয়ে বসলাম। সোজাসুজি তাকালাম তাঁর চোখের দিকে—'আচ্ছা আপনার ঐ ছেলেটা বাংলা বোঝে ?'

'না, কেনে ?'

'আপনি তামিল ভাষা বোঝেন ?'

'না, কেনে ?'

'কিছু বোঝেন না, জানেন না, ক্যাম্প থেকে বেরুতে পর্যন্ত আপনি চাননা অথচ আপনি ওদের জীবনের এতসব কথা বুঝে ফেললেন ?'

'বা তা কেনে বুঝবেনি ?' অনন্তদা অনায়াস বিশ্বাসে বললেন, আমার মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে তারপর হঠাৎ বোধ হয় টের পেলেন আমার প্রশ্নের ধরনটা মোটেই নিরীহ নয়। দেরি করে হলেও হঠাৎ তাঁর চোখে পড়লো, আমার চোখমুখ কেটে ক্ষুরধার অবিশ্বাসী হাসি উঠছে ছাপিয়ে।

হাঁ করে আমার মুখের দিকে চেয়ে তারপর হঠাৎ যেন আহত ভাবে উঠে গেলেন আস্তে আস্তে, 'তমরা…ইঞ্জিরি · জানো…কিন্তু কেনে বুঝবেনি…'

সম্মেলনের কাজটা শেষ হয়ে গিয়েছিল। বাঁধাছাঁদা করে এবার ফেরার পালা। দেশটা সত্যিই সুন্দর। আশ্চর্য তার মন্দির আর গোপুরমের অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ। আশ্চর্য তার চারপাশ দিয়ে রচা নীলাভ পাহাড় আর তালবনের আঁচড়। যারা একদিনে জায়গাটা বিশেষ দেখে উঠতে পারেননি তাঁরা ট্রেন ছাড়ার আগে যেটুকু সময় আছে সেটুকুকে পরিপূর্ণ ব্যবহার করার জন্য ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছেন দিকে দিকে।

রাস্তায় ঘুরছিলাম, দেখি অনন্তদা। পায়ে কেডস্, চুয়াল্লিশ ইঞ্চি ধুতিটা মালকোচা দিয়ে পরা। আনাড়ীর মতো এদিক ওদিক চাইতে চাইতে অনন্তদা চলেছেন আপন মনে।

'কোথায় চলেছেন অনন্তদা'

আচমকা আমাকে দেখে একটু বিব্রত হয়ে উঠলেন অনন্তদা, 'না এই দেখতেছি—'

সেই রাত্রের পর থেকে অনন্তদা আমার কাছে আর আসেননি। কেন জানি এড়িয়ে এড়িয়ে চলছিলেন! একটা দুষ্ট বুদ্ধি মাথায় এল বললাম, 'চলুন, আপনার সেই ছেলে আর তার মাকে দেখে আসি।'

অনন্তদা যেন ভূত দেখেছেন এমনি বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইলেন আমার দিকে তারপর মুখ ফিরিয়ে গুঁই গুঁই করে বললেন, 'না আর কি হবে যেয়ে······'

'না চলুন, যেতেই হবে আপনাকে—'

অনন্তদার মুখ এত বিপন্ন কখনো দেখিনি।

দুর্বোধ্য ভাষা আর অপরিচিত দৃশ্যের এ শহরটার ভেতর দিয়ে ভয়ে ভয়ে আনাড়ীর মতো অনন্তদাকে হাঁটতে হলো আগে আগে। আমি পেছনে। হয়ত একটু নিষ্ঠুরতা হচ্ছে, তা হোক। অনন্তদার সরল গ্রাম্য মনের অতিকল্পনাটাকে হঠাৎ একটা রূঢ় আঘাত দিয়ে ভেঙে দেবার ইচ্ছেটা যেন পেয়ে বসেছিল আমাকে। আর সব দিক দিয়ে আশ্চর্য এই গ্রাম্য কর্মীটির মধ্যে কেন থাকবে এই নিতান্ত গেঁয়ো বাঙালী সুলভ, বাস্তববুদ্ধিহীন, প্রায় অপ্রাকৃতিক এই স্বপ্ন লোলুপতা?

তিনবার চারবার পথ ভুল করে করে শেষ পর্যন্ত অনন্তদা যেখানে ঢুকলেন, সেটা একটা বস্তির মতো। সংকীর্ণ গলিটার দুপাশে ঘিঞ্জি নোংরা সারি সারি ঘর। বোঝা যায় এক একটা ঘরে একাধিক পরিবারের বাস। কালো কালো ছেলে পিলে আর নানা কাজে ঘোরাফেরা নানা বয়সের নানা রঙের তাঁতের শাড়ি পরা মেয়েদের হাঁটা-হাঁটিতে রাস্তা ভরা নানা রঙের শাড়ি, কিন্তু কি অসহ্য জীর্ণ।

অনন্তদা থামলেন, 'এসে গিয়েছি', তারপর আনাড়ীর মতো উঁকি দিতে লাগলাম এদিকে ওদিক। অবশেষে সত্যি সত্যি এসে দাঁড়াল একটা ছেলে। বছর দশ এগারো বয়স। হাড় খটখটে প্রকাণ্ড একটা মাথা। মিশমিশে কালো রঙ, খড়ি ওঠা ওঠা।

কোদালে দাঁত বার করে ছেলেটা হাসল অনন্তদাকে দেখে। বোঝা গেল অন্তত ছেলেটা অনন্তদার মুখচেনা। কে জানে হয়ত আমিও চিনি। সম্মেলনের গেটের পাশে যে মজুর স্বেচ্ছাসেবকদের

দলটা দাঁড়িয়ে থাকত, আমাদের ঢোকবার সময় আর বেরুবার সময় ছেঁড়া কাগজ মেলে ধরত অটোগ্রাফ নেবার জন্যে বোধ হয় তাদেরই কেউ হবে।

অনন্তদাও হাসলেন, কিন্তু কথা বললেন না। ছেলেটা হড়বড় হড়বড় করে তামিল ভাষায় এক নাগাড়ে কি যেন বলে গেল। ভাবভঙ্গি দেখে মনে হল তার আমাদের ভেতরে নিয়ে যেতে চায়।

গেলাম ভেতরে। বাইরের চেয়ে এ ভেতর যে বেশি সুখপ্রদ তা বোধ হলনা। চারিদিকে শুধু সংসারের অন্তরঙ্গ নিদর্শনগুলো আরো বেশি করে ছড়ানো এইমাত্র। অদ্ভুত আকারের পেতলের বাসন দুই একটি। দু'চারটি এলুমিনিয়াম। বস্তা, খাটিয়া, উদুখল, চুল্লী। ছেলেটা ভেতরে নিয়ে গিয়ে হাড়কটকটে এক বুড়ীকে ডেকে নিয়ে এল কোথা থেকে। বুড়ীর সারা গায়ে তখনো পর্যন্ত তুলোর ফেঁসো জড়ানো, এক গোছা ফলের মতো কান থেকে ঝুলন্ত পেতলের মলিন অলঙ্কারগুলোয় কোণে কোণেও মাকড়সার জালের মতো তুলোর আঁস লেগে আছে।

বোঝা যায় এই বয়সেও সম্ভবত অদূরের বিলিতি সুতো কারখানাটায় বুড়ীটাকে কাজ করতে হয়।

পরখ করার জন্যে খানিক হিন্দী আর ইংরেজীর সাহায্য নিয়ে দেখলাম—না, এ অন্তপুরে ভাষার ভেলা অচল।

এ কান থেকে ও কান পর্যন্ত অসমান দাঁত বার করে ছেলেটা আবার হাসল। তারপর নির্ভেজাল তামিল ভাষায় সবিস্তারে আমাদের কি বললে। আমরা বুঝতে পারছি না দেখে নিজেদের মধ্যে আবার কি বলাবলি করলে। তারপর আবার আমাদের উদ্দেশ্যে সেই অবিশ্রান্ত বিশুদ্ধ তামিল।

অনন্তদার গা টিপলাম, 'আপনার সেই অদৃষ্টপূর্ব ছেলেটিকে তো দেখা গেল। এবার বাক্যালাপ না পারেন অন্তত কিছু একটা করুন। খামকা উজবুকের মতো কাঁহাতক বসে থাকা যায়?'

অনন্তদা ভীত ভাবে আমার দিকে তাকালেন। 'কি আবার করা যাবে? চলে যেতেছি—তাই দেখা করা এই আর কি—'

অনন্তদার কথাটা আমিই আকারে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করলাম—ট্রেন ?…রেল ?…স্টেশন ?…আজ চলে যাবো। সম্মেলন শেষ হয়েছে। চলে যাচ্ছি…।

নানা উপায়ে চলে যাবার ইঙ্গিতটা বুঝিয়ে দেওয়া গেল কোনো রকমে। নাকি বুঝল না কে জানে।

আবার কলকল করে কি বলে যেতে লাগল আমাদের দিকে চেয়ে।

সেই দুর্বোধ্য তামিল। তার এক বর্ণের অর্থতো দূরের কথা, উচ্চারণ মনে রাখাও সম্ভব নয়। শুধু এক নাগাড়ের এই বাক্যস্রোতের মধ্যে ঝাপ্‌সা ভাবে মাঝে মাঝে মনে হয় বুঝি বা ওর 'কমরেড' কথাটাও শুনলাম দু' একবার।

অনন্তদার দিকে চাইলাম। আমার চোখ এড়িয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছেন অনন্তদা অন্যদিকে।

বললাম, 'ফিরুন যথেষ্ট হয়েছে—'

অনন্তদা মুখে বললেন, 'হাঁ চলো।' কিন্তু নড়লেন না, আমার দিকেও তাকাতে পারলেন না।

তারপর এক অদ্ভুত ব্যাপার হল। ওরা কি বুঝেছিল কে জানে। ফেঁসো জড়ানো যে বুড়ীটা এতক্ষণ কাঠের মতো নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়েছিল দূরে, সে কাছে এল খানিকটা। তারপর ধীরে ধীরে ছেঁড়া কাগজের মতো কি একটা বার করে এগিয়ে দিল আমাদের দিকে।

প্রথমটা বোঝা যায়নি। পরে বোঝা গেল, খবরের কাগজের খানিকটা টুকরো। তামিল ভাষার কোনো কাগজ—তাতে একটা ছবি। হয়ত মর্গে তোলা। শক্ত বলিষ্ঠ গড়নের একটা হাঁ-করা মরা মুখ উঁচু হয়ে আছে আকাশের দিকে। চওড়া কাঁধের ওপাশ থেকে জামার যে অংশটা ছবিতে ধরা পড়েছে, তাতে গাঢ় কালো রঙের ছোপ, হয়ত তার আসল রঙটা রক্তের।

ঘুপচি কোণটার মধ্যে যারা জুটেছিল তাদের মুখ থেকে মৃদু আফসোসের একটা শব্দ উঠল—আহ্।

ছেলেটা তামিল ভাষায় অনর্গল আবার কি সব বললে। অনন্তদা সেই একইরকম আনাড়ীর মতো চেয়ে আছেন। অন্য সময় হলে খোঁচা মেরে আর একবার ঠাট্টা করতাম হয়ত, কিন্তু ঐ বিবর্ণ রক্তের ছবিটা কেমন এলোমেলো করে দিয়েছে সব। অস্বস্তি লাগছিল। কার ছবি, কেন তোলা হয়েছিল, তা দেখিয়ে ওরা কি বলতে চায় কিছু জানিনা। শুধু থমথমে লাগছে চারিদিকটা। একটা কিছুই বলা উচিত, একটা কিছু জিজ্ঞেস করা উচিত কিন্তু তার কোন উপায় নেই। শুধু থমথমে অস্বস্তিটা পীড়াদায়ক হয়ে উঠতে লাগল ক্রমশ। অনন্তদাকে বললাম 'চলুন।'

ফিরে আসছিলাম। বুড়ীটা তার স্তব্ধতা ভেঙে ছুটে এল হঠাৎ, হঠাৎ এসে কাঁপা কাঁপা হাত দিয়ে স্পর্শ কবতে শুরু করলে আমাকে, অনন্তদাকে। কালো, বুড়ো, শীর্ণ, কাঁপা কাঁপা হাত বুলোতে শুরু করলে অনন্তদার পাকাচুলে ভবা মাথায, কপালে থুতনিতে। আর অনর্গল বকবক করে বকে যেতে লাগল কি সব। শুকিয়ে আসা মুখটা ভয়ানক রকম কাঁপতে কাঁপতে অনর্গল কি যেন বোঝাতে চাইল বারবার। অথচ কী বলব আমরা কী করে বোঝাব। অথচ কিছু একটা বলতে হবে—কি করে সইব এই কিছু না বলে নির্বাক হয়ে থাকা ?

নির্বাক অনন্তদা আমার দিকে চাইলেন। তাঁর দুই চোখে এক অসহ্য পীড়া। ডাক্তারের চোখের সামনে যখন কাউকে নগ্ন হয়ে দাঁড়াতে হয় তখন তাব দুচোখে যেমন একটা অসহায় নির্লজ্জতা জেগে ওঠে, অনন্তদার চোখে তেমনি একটা যন্ত্রণাকর নির্লজ্জতা। একি তাঁর পরাজযের নির্লজ্জতা ? নাকি অন্যকিছু ?

হঠাৎ চমকে উঠলাম ! হঠাৎ কথা বলতে শুরু করেছেন অনন্তদা ! হাঁ, অনন্তদা কথা বলছেন, ইংরেজীতে নয়, তামিলে নয়, হিন্দীতে নয়, তাঁর নিজস্ব তেরো না এগারো নম্বর ইউনিয়নেব বিশুদ্ধ গ্রাম্য বাঙলায়। অপরিচিত বুড়ীটাকে দুই হাত ধরে কোনোদিকে না তাকিয়ে ভাঙা ভাঙা গলায় অনন্তদা সান্ত্বনা দিয়ে বলছেন—'কেঁদোনি। কাঁদলে কি তমার

বেটা ফিরবে! ফিরবেনি। আমাদের গাঁয়েতেও তো ই রকম হয়েছে। চাষীরা কি দোষ করেছিল? তো গুলি চালালে কেনে তমরা? সারা দুনিয়ায় তো এই হতেছে যে মা। কি করবে। তবে একদিন এর শেষ দেখতে হবে! আমরা তো আছি। তমার অন্য বেটা রয়েছে··· আমাদের ভাগচাষী এলাকার কথাটা তো তমাকে বলি শুনো··· ?'

যেন এ এক অপরিচিত ভাষার বিদেশ নয়, ১৯৪৯ সালের কোন চাষী মাকেই বুঝি সান্ত্বনা দিচ্ছেন তাঁর গাঁয়ে বসে।

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি। অকালে চুল পেকে যাওয়া কেডসপরা অনন্তদার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েছে এক কাঠের মত কালো শুকনো বুড়ী। অনন্তদা সান্ত্বনা দিতে দিতে কথা বলছেন বাঙলায়। বুড়ী শুনছে, তারপর অনায়াসে উত্তর দিচ্ছে তামিলে। কাউকে বুঝতে কারু এতটুকু অসুবিধা হচ্ছে না।

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

হ্যাংলা

ওরা আসবে। নিজের চোখে নাকি দুঃখ দেখে যাবে মানুষের। ব্যবস্থা করবে। কারণ ব্যবস্থা করার ক্ষমতা নাকি ওদের আছে।

খবরটা ছড়িয়ে গেছে চারিদিকে। সকাল থেকেই তাই ধারে কাছের লোকেরা এসে জুটেছে আগে। আরো লোক আসছে একজন দুজন করে আরো দূর থেকে; বিস্তীর্ণ বাদা, গাঙ, পাঁক আর জলা উজিয়ে উজিয়ে। দূর থেকে নজরে পড়ে, জ্যৈষ্ঠ মাসের কটকটে রোদ্দুরের মধ্যে কখনো বাঁধের ওপর কখনো আধ-শুকনো কাদার মধ্যে তাদের ইতস্তত চলমান কালো কালো কাঠি কাঠি মূর্তিগুলো। রোদ আর নুনে পোড়া ধূসর অঞ্চলটার চারিদিকেই কেমন একটা পাঁক রঙা কালচে ছোপ। তার মধ্যে থেকে কখনো বিন্দুর মত কখনো আরো স্পষ্টতর হয়ে পোড়া কাঠির মত মূর্তিগুলো আসে হাঁপাতে হাঁপাতে। খানিক বসে। আবার হেঁটে আসে হাঁপাতে হাঁপাতে।

ঘাটের পাশে একটা প্রাচীন আম গাছ। সেখানে খানিক ছায়া পড়েছে। কিছু লোক গিয়ে বসেছে সেই আম গাছ তলায়। আরো কিছু লোক ছায়া খুঁজে খুঁজে বেড়ায় এখানে ওখানে। ঘাটের সামনেই সারি সারি কয়েকটা টিনের চালা নামানো দোকান ঘর, ডাক্তারখানা ইত্যাদি। ঘরগুলোর বারান্দায় উঠে বসতে ভরসা পায়নি অনেকে। বারান্দার আশেপাশে টিনের চালার উদ্‌বৃত্ত ছাটটুকুর নীচে গিয়ে জেরা

পেতেছে। ঘরের দেওয়াল ঘেঁষে নামা দু-পহরের স্বল্প ছায়াটুকুতে মাথা গুঁজেছে কেউ।

জোয়ান পুরুষেরা বেশি আসেনি। কারণ তাদের অনেকেই আর জোয়ান নেই। যারা সমর্থ তাদের অনেকেই আর গাঁয়ে নেই। খিদে সইতে না পেরে ছড়িয়ে পড়েছে এদিক ওদিক খাটুনির সন্ধানে। কেউ পালিয়েছে। যারা এসেছে, তাদের বেশির ভাগই মেয়ে, বুড়ী-বেওয়া; নয়তো কঙ্কালসার অথর্ব পুরুষ।

এর মধ্যে হৈ চৈ তদারক করছে মানিক সর্দার।

মানিক সর্দারকে চিনত না এমন লোক এ অঞ্চলে কম। মোষ-কালো চেহারা। সেবারে ভাগচাষের দাবি নিয়ে আন্দোলন হাঙ্গামা-গুলোর সময় মানিক সর্দার ক্ষেপে উঠেছিল সবার আগে। সম্পত্তি বলতে তার ছিল শুধু দুটি গাই মঙ্গলা আর কালী। সেই গোরু ক্রোক করতে এলে মানিকের বৌ একলা দা নিয়ে তাড়া করে গিয়েছিল পুলিসগুলোকে। তারপর ঘাটের পাশের এই আম গাছটার তলাতে একদিন জড়ো হয়েছিল মানুষ। এমনি বুড়ো বেওয়া কঙ্কালের দল নয়, তাজা মরদ ভাগচাষীর দল। তাদের সামনে ছিল মানিক, তেলচকচকে কালো জোয়ান মূর্তি। পিঠের ওপর থাক্ থাক্ মাংসপেশীর চাপে কুঁজো বলে মনে হত তাকে। চ্যাপ্টা চওড়া ঘাড়। কথা বলত খানিকটা জড় অনাড়ীর মত। মোটা জিভের দুই পাশ দিয়ে থুথু ছেটাত খানিক খানিক। ঠোঁটের দুই কোণে দুই বিন্দু সাদা লালা জমে থাকত সব সময়। সেই মানিক সর্দার ছিল সব চেয়ে আগে-বাড়া লোক!

তারপর গুলি চলেছে। খুন জখম হয়েছে। গ্রেপ্তার গারদ হয়েছে। মানিক জেলে গেছে, জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে। দিন এগিয়েছে। তারপর লোনা জল আর দুর্ভিক্ষ, খিদে আর খিদে। কোনদিন যে এখানে মানুষ কাঙালের মত দুটি ভাতের প্রত্যাশা ছাড়া অন্য কিছু ভেবেছে কিনা, মনে নেই কারো। গুলি চলেছিল বটে কিন্তু কতদিন আগে, কত বছর আগে—তা চট করে মনে পড়ে না। এক প্রচণ্ড হা-হা করা আসন্ন বিপদের সামনে ঝাপ্সা হয়ে আসে সব কিছু।

সেই মানিক সর্দারই আজও হৈ চৈ তদারক করছে। কিন্তু দুর গ্রামের লোক, দৃষ্টি ক্ষীণ হয়ে আসা বুড়ীরা হঠাৎ তাকে দেখে আজ আর চিনতে পারে না।

সেই মদ্দ জোয়ান চেহারা আজ হয়েছে এক বীভৎস, কাঁকলাসের মত। তার মাজা কালো রংটা উপবাসে উপবাসে হয়ে উঠেছে রোদে পোড়া কর্কশ—আলকাতরা মাখা পুরনো কাঠের মত ফাটা ফাটা।

মানিককে দেখে চিনতে পেরে কেউ কাঁদে। হঠাৎ টস টস করে জল বেরিয়ে আসে চোখ দিয়ে। নিজেদের কঙ্কালসার আত্মীয়স্বজনের চেহারা মনে পড়ে যায়। কেউ কাঁদে না, বিমূঢ়ের মত তাকিয়ে থাকে শুধু। তেভাগার দিনেও বিশ্রাম ছিল না মানিকের, দুর্ভিক্ষের দিনেও তার বিশ্রাম নেই। যারা আসে বুড়ো, বুড়ী, বেওয়া—ক্ষুধার্ত উৎসুক অবসন্ন চোখে মানিককে ঘিরে ধরে, প্রশ্নে প্রশ্নে অস্থির করে তোলে। আর সে প্রশ্নের মধ্যে কী দারুণ কাঙালপনা! কী দারুণ দীনতা!

'হ্যাঁ বাবা আসবে তো?'

'হাঁ আসবে। পিসিডেন তো বলতেছে যে তার এয়েছে।'

'হাঁ বাবা মানিক, আমাদের চাল দিবে তো?'

'খয়রাতি টাকা যে পায় না কেউ, হাঁ বাবা মানিক—?'

'আমাদেরও দিবে তো?'

'তা হলে কিছু হবে আমাদের?'

এক প্রশ্ন। মানিক অবসন্ন দেহে হাঁপাতে হাঁপাতে একবার এখানে একবার ওখানে তদারক করে বেড়ায়, উপদেশ দেয়, কি করতে হবে না হবে সতর্ক করে দেয়। তারপর মাঝে মাঝে হতাশ হয়ে বলে 'জানিনি বাবু!'

তারপর এক সময় হঠাৎ হিংস্র গলায় চিৎকার করে ওঠে—'কিন্তু পা ধরতে পাবিনি বলে দিচ্ছি! তোমরা যদি ওদের পা ধরাধরি করতে যাবে কি কান্নাকাটি করবে তো ভালো হবে নি…'

চারিদিককার কাঙালদর্শন ধূসর ভিড়টা হঠাৎ গুনগুন করতে করতে থমকে যায়। ফ্যালফ্যাল করে তাকায় এই অদ্ভুত মেজাজের লোকটার

দিকে। কেউ কেউ হঠাৎ ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করে, 'কিন্তু হাতে পায়ে না ধরলে যদি কিছু না দিয়েই চলে যায়?'

মানিক অনিশ্চিতভাবে বোঝাবার চেষ্টা করে, দাবি, দাবি করবে তারা। তারা ভিক্ষে চাইছে না, খাদ্য দাবি করছে। কই অনুনয় বিনয় করে কিছু হয়েছিল? আন্দোলন করেছিল বলেই না আজ মন্ত্রীদের আসতে হচ্ছে। বোঝাতে বোঝাতেই মানিক টের পায় তার উপদেশ বুঝি মাথার ওপর দিয়ে চলে যাচ্ছে সবার। তার কথাগুলো নিতান্ত হালকা বিবর্ণ মনে হচ্ছে এই তিনদিন চারদিনের উপোসী মেয়েগুলোর কাছে। বোঝাতে বোঝাতেই তাই সে অকারণে থেমে যায় আবার। অকারণে চটে ওঠে হঠাৎ।

যারা শোনে তারা গুন গুন করতে করতে চুপ করে থাকে কিছুক্ষণ। হয়তো ভাবে হাতে পায়ে না ধরলে, যে মন্ত্রী হাকিম ম্যাজিষ্ট্রেটরা আসছে তাদের পা জড়িয়ে ধরে কান্নাকাটি না করলে ওরা কি বুঝবে যে এখানে এত খিদে, এখানে এত উপবাস, খাওয়া অভাবে কঁকিয়ে কঁকিয়ে এখানে মায়ের কোলে মরে থাকছে শিশু! তারপর বুড়ী মত কেউ এগিয়ে যায়। কাতর অনুনয়ের ভঙ্গিতে মানিকের গায়ে মাথায় হাত বুলায়, থুতনিটায় আঙুল দিয়ে চুম্বনাশীষের ভঙ্গি করে বলে—'হেই মানিক তা নইলে যে দিবেনি ওরা। আশা করে এয়েছি এতদূর! ছানাগুলোর ভিরমি লাগছে। কিছু ক্ষেতি হবে না, বাবা…'

এই করুণ চোখগুলোর সামনে মানিকও সব সময় উত্তর দিতে পারে না। শুধু রাগ করে ঝটকা মেরে হাত সরিয়ে দিয়ে চলে যায় অন্য দিকে গজ্ গজ্ করতে করতে।

মানিককে ঘিরে ধরা ভিড়টা থেকে একটু দূরে ফ্যাল ফ্যাল করে রোদ্দুরের মধ্যেই ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে বছর চোদ্দ বয়সের একটি মেয়ে, আর একটি বুড়ী। বোঝা যায় অনেক দূর থেকে, অনেক পথ হেঁটে হাঁপাতে হাঁপাতে তারা এসেছে। বুড়ীটার ছেঁড়া ঝুলি ঝুলি ময়লা কাপড়ের জায়গায় জায়গায় পাঁকের কাদা শুকিয়ে লেগে আছে এখনো। মেয়েটার পরনের শাড়িটা অত জীর্ণ নয়। কিন্তু এত খাটো যে তার

তরুণ দেহটা সবখানি ঢাকা পড়েনি। উপবাস সত্ত্বেও মেয়েটির নরম চলচলে মুখটার কচি আমেজটা রুক্ষ হয়ে ওঠেনি এখনো। শুধু ঠোঁট দুটো কেমন যেন অভিমানে স্ফুরিত। চোখদুটো কেমন ছলছলে।

বুড়ীটা এতক্ষণ ঝাপসা চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে মানিকের কথাগুলো শোনার চেষ্টা করছিল। মেয়েটাকে ঠেলা দিয়ে জিজ্ঞেস করে 'হাঁরে টুকি, কি বলতেছে কি মানিক সর্দার ?'

টুকি অভিমান স্ফুরিত টসটসে চোখে অন্যদিকে তাকিয়ে রাগ করে বলে—'কি জানি !···বলতেছে যে পাযে হাতে ধরা চলবে না ··'

বুড়ী উত্তর দেয় না। ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে কাঁপতে ঘাটের ঠিক ওপরকার বাঁধটাতেই গিয়ে বসে। জায়গাটার এক বিন্দু ছায়া নেই। চনচনে কাঠফাটা রোদ্দুর। গাঙটা থেকে মাঝে মাঝে তেমনি গরম লোনা হাওয়ার ঝাপটা এসে লাগে মাঝে মাঝে। বেশিক্ষণ বসে থাকলে শুকনো পেটে মাথা ঝিম্ঝিম্ করতে থাকে।

বুড়ীটা আবার জিজ্ঞেস করে ফিস ফিস করে—'আমি বুড়ী বেওয়া, আমি গিয়ে পা ধরলে কি ক্ষেতি ?'

টুকি তেমনি অভিমান স্ফুরিত কণ্ঠে বলে—'কি জানি !'

এদিক ওদিক থেকে এখনো লোক আসছে এক আধজন করে। ছেলে কাঁখে বৌ ; নাতির কাঁধে হাত দিয়ে লাঠি ঠুকঠুক করতে করতে আসা ছন্নছাড়া উদ্‌ভ্রান্ত প্রেতের মত চেহারার দু-একটা পুরুষ। যারা নতুন আসে তারা আবার নতুন করে ঘিরে ধরে মানিক সর্দারকে।

'চাল দেবে তো, রিলিফ দেবে তো ? ঢেঁচোর মূল খেয়ে খেয়ে আর তো পারা যায় না মানিক।'

মানিক অবসন্নভাবে একই কথা আবার শোনায়। তারপর আবার একইভাবে ধমক দেয়—দিক না দিক হাতে পায়ে ধরা চলবে না। ভিক্ষুকের মত ব্যবহার করা চলবে না। ক্ষিপ্ত হয়ে সে মাঝে মাঝে চিৎকার করে ওঠে—'তেভাগের সময় পুলিস কম হায়রান করেছিল ? কিন্তু তমরা কজন ঘাড় ঝুঁকিয়েছিলে ? কজন দারোগার পা ধরতে গেছলে ? তবে ? এখন এত কাতর হলে চলবে ?'

ছায়ামূর্তি মেয়েগুলো ছেলে কাঁখে করে চেয়ে থাকে ফ্যাল ফ্যাল করে। তারপর ফিসফিস করে বলে—'পেটের জ্বালা যে সয়নি মানিক। এত উপোস যে মানে না....'

ঘাটের ওপর রোদ্দুরে বসে থাকতে থাকতে বুড়ী আবার জিজ্ঞেস করে—'হাঁরে টুকি, আরো লুক আসতেছে ?' টুকি ভয়ে ভয়ে বলে 'হাঁ, আনেক লোক দিদি।'

বুড়ী ফিসফিস করে বলে যাতে কেউ শুনতে না পায়, 'তবে তো কম পড়ে যাবে!'

'কি ?'

বুড়ী শঙ্কিতভাবে জানায়—'চাল! এত লুক এলে ভাগে ক-মুট করে পড়বে ?'

টুকি কান্নাভরা গলায় বলে 'কি জানি।' আর চওড়া কালচে লোনা জলে ভরা গাঙটার মোড়ের দিকে তাকায়। কখন আসবে ওরা। কখন ওই বাঁকের ওপাশ থেকে হঠাৎ দেখা দেবে ওদের লঞ্চ। অপেক্ষা করতে করতে রোদ্দুরে ঝিম ঝিম করে দেহ। টুকি উসখুস করে বলে—'ছায়ায় চল দিদি, রোদে মরে যাব!'

কিন্তু বুড়ী অনড়। একেবারে ঘাটের সামনের এই জায়গাটুকু ছেড়ে সে নড়বে না। কারণ এইখানেই যে প্রথম লঞ্চ লাগবে। এইখানেই প্রথম ওরা নামবে। তাই ওরা যদি এখানে থাকে তবে সবচেয়ে সুবিধা। যদি রিলিফের জন্য নাম্ লিখে নেয়, তবে আগে ওদেরই নাম লিখতে হবে। যদি মুঠো মুঠো করে চাল দেয়, তবে আগে ওদেরই চাল দিতে হবে। অন্য কোথাও বসলে কি জানি যদি ওদের চোখে না পড়ে ? ভিড়ে ঠেলাঠেলিতে যদি ঠিক ওদের বেলাতেই চাল ফুরিয়ে যায় ?

বুড়ী তার শতছিন্ন কাপড়ের আঁচলটা জড়ো করে মাথায় চাপা দেয়। নাতনিকে উপদেশ দেয়—'মাথায় কাপড় চাপা দে, রোদ লাগবেনি...'

টুকি তার খাটো শাড়িটাকেই টানাটানি করে মাথায় চাপাবার চেষ্টা করে। ফলে তার কচি দেহটার অনেকখানিই উদ্‌লা হয়ে পড়ে। উঁচু হয়ে হাঁটুর ওপর থুতুনিটা রেখে টুকি আবার তাকিয়ে থাকে গাঙের

দিকে। মাঝে মাঝে শিউরে ওঠে। বুড়ী সারা রাস্তা তাকে উপদেশ দিতে দিতে এসেছে। কেমন করে আগে জায়গাটা নিয়ে দাঁড়াতে হবে, কেমন করে পা জড়িয়ে ধরতে হবে বাবুদের, কেমন করে ওদের করুণা জাগাতে হবে, 'আমাদের বাঁচাও গো বাবুরা, আমাদের ছুটি খেতে দাও গো বাবুরা, নয়তো মরে যাব···'

কিন্তু যদি ওরা কিছু না দেয়? যদি দেখে এরা অনুনয় বিনয় করছে না, এবং তা দেখে যদি ওরা না দেয়, তা দেখে যদি ওরা বুঝতে না পারে যে এদেশে সত্যিই এত হাহাকার? আর তারপর যদি কিছু না দিয়েই আবার চলে যায় লঞ্চে? তবে? যারা দিতে পারে, যারা ইচ্ছা করলে দু-হাত ভরে দিতে পারে, এমন লোকেরা যদি শুধু একটুখানির জন্যে না দিয়ে আবার চলে যেতে চায়, তখন? তখনও কি তারা দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে? আচমকা ছুটে গিয়ে ওদের পা জড়িয়ে ধরে ঠেকাবার শেষ আকুল চেষ্টা না করে পারবে?

টুকি শিউরে উঠে ছলছলে চোখে বলে ওঠে, 'না দিদি পারবনি! তুই আমাকে ধরিস দিদি··'

বুড়ী কি যেন ভাবছিল, ফিসফিসে গলায় জিজ্ঞেস করে 'কি?'

'মানিক সর্দার বলতেছে, পা ধরাধরি করা চলবেনি—।'

বুড়ী চুপ করে থাকে। তারপর বলে—'না, তুই যাসনি। আমি বুড়ী বেওয়া, আমি যদি হাত পা ধরি, তবে ক্ষেতি হবেনি। কিন্তু তুই যাসনি সামনে ·······'

দূরে গাঙের কালচে লোনা জলটা রোদ্দুর পড়ে খাঁ খাঁ করে কেমন।

ওরা সত্যিই আসছে।

সারি সারি মোটর গাড়ি। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, প্রাদেশিক মন্ত্রী, রিলিফ মন্ত্রী, প্রচার বিভাগ, সাংবাদিক, আর্দালী, প্লিমাথ, ফোর্ড, ক্যাবিনেটে ঢাকা পাবলিসিটি ভ্যান, পুলিসভর্তি ওয়েপন কেরিয়ার, জীপ আর ওয়্যারলেস ভ্যান—সারি সারি অটোমোবিলের এক দীর্ঘ কনভয় দাঁড়িয়ে আছে প্রস্তুত হয়ে।

'তাহলে স্টার্ট দিই স্যার....'

'হ্যা দাঁড়াও—'

মোটরে ওঠার মুখে মন্ত্রীদের ঘিরে ধরেছে সাংবাদিক দল। সাংবাদিকদের ঠেকা দিচ্ছে সতর্ক সরকারী কর্মচারীরা। যাত্রা শুরু করার আগে একটা দুটো প্রশ্ন করে নিচ্ছে, একটা দুটো খবর জেনে নেবার চেষ্টা করছে।

'তাহলে স্টার্ট দিই স্যার....'

'হ্যাঁ স্টার্ট!'

প্রথম দিককার গাড়িগুলো চলতে শুরু করে প্রথমে। মন্ত্রীদের সঙ্গে সঙ্গে চলার জন্য ভারপ্রাপ্ত সরকারী অফিসার মিঃ মজুমদার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেন সব উঠেছে সব ঠিক আছে কিনা। তারপর চারিদিক দেখে সন্তুষ্ট হয়ে গাড়িতে উঠে বসেন—সামরিক স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন—'উহ্! হেল্ অব এ জব্... ।'

প্রচার বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে চলেছেন সরকারী ফটোগ্রাফার রায়। মজুমদারকে তোয়াজ করার ভঙ্গিতে হেসে হেসে বলে, 'যা বলেছেন!'

মুখার্জী গাড়ি থেকে বাইরে মুখ বাড়িয়ে বলে, 'তাহলে চলছি। ক-ঘণ্টা লাগবে হে মজুমদার—'

ফটোগ্রাফার রায়ের হঠাৎ খেয়াল হয়, কিন্তু ঠিক কোথায় যাচ্ছে তা সে জানে না। জিজ্ঞেস করে, 'কিন্তু কোথায় যাচ্ছি আমরা?'

মুখার্জী সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বলে—'ওই যে দুর্ভিক্ষ হয়েছে যে জায়গাটায়। কি নাম যেন? আহ্...'

হঠাৎ দেখা গেল মুখার্জীরও মনে নেই জায়গাটার নাম। কোথাও খুব দুঃখ কষ্ট হয়েছে এইটুকু মনে আছে কিন্তু ঠিক কোথায় তা মনে নেই। সামনের সীট থেকে ড্রাইভার পেছনে না তাকিয়েই বলে—'আমি তো সামনের গাড়িটা দেখে চলছি। যেখানে যাওয়ার চলে যাব ঠিক...'

মজুমদার এতক্ষণ ধরে নতুন একটা সিগারেটের টিন কাটছিল। টিন কেটে সিগারেট ধরিয়ে আবার বললে—'ওহ্! হেল্ অব এ জব্! বিশেষ করে ওই সাংবাদিকগুলো।'

মুখার্জী সায় দেয় 'রিয়েলি! প্রশ্নের পর প্রশ্ন। আরে বাবা চলো আগে। দেখ। তারপর খবর জানতে চাইলে এস, তা নয়...'

মজুমদার তিক্ত কণ্ঠে বলে—'তুমিই তো। তুমিই তো প্রায় ডুবিয়েছিলে—'

'কেমন করে?'

'বাঃ, তুমি তো ট্র্যাপে পড়ে গিয়েছিলে একেবারে। আমি যত ঠেকাবার চেষ্টা করছি, তুমি ততই বোকামি করে চলেছ—আমাদের এই প্লান আছে, রিলিফ কিছু বাড়িয়ে দেব, হেন করব, তেন করব... আরে বাবা, প্লান আছে কি না আছে, তা তোমার বলার কি দরকার! একটা রিপোর্টার তো ঝাঁ করে প্রশ্নই করে বসল—তাহলে, আপনারা যখন এলাকাতে না গিয়েই প্লান তৈরি করেই ফেলেছেন তখন আর এই যাওয়া কেন? সী দেয়ার ট্র্যাপ! এই সাংবাদিকরা, জানো, তারা কিছুই বিশ্বাস করে না, কিছুতেই কিছু এসে যায় না, কিন্তু এতটুকু একটু ত্রুটি একটু স্ক্যাণ্ডাল পেলেই হল। ব্যাস্ আর রক্ষা নেই....'

মুখার্জী তার বোকামির প্রকৃতিটা এতক্ষণে টের পেয়ে থতমত খেয়ে চুপ করে যায়।

দীর্ঘ কনভয়টা ইতিমধ্যে কলকাতার রাজপথ ছেড়ে শহরতলীর এলাকায় গিয়ে পড়ে। কলকাতার রাস্তার লোকেরা কনভয়টার দিকে বিশেষ ভ্রূক্ষেপও করছিল না। শহরতলী এলাকার লোকেরা অত ভ্রূক্ষেপহীন হতে পারেনি। রাস্তায় চলমান ভিড়ের মধ্যে থেকে লোকে উৎসুক হয়ে ঘাড় ফিরিয়ে তাকায়। তিন-চারটে বিলাসপুরী কুলি মেয়ে আচমকা ভয় পেয়ে হাঁটুর ওপর কাপড় তুলে রাস্তার মাঝখান থেকে ছুটে পাশে গিয়ে দাঁড়ায় অবাক হয়ে। দোতলার জানলার শিক ধরে একটা ন্যাংটো ছেলে হঠাৎ আনন্দে লাফাতে শুরু করে।

উর্দিপরা বেয়ারাটা এতক্ষণ চুপ করে ড্রাইভারের পাশে বসে ছিল, সে জিজ্ঞেস করে অন্যমনস্কভাবে—'তাহলে যেখানে যাচ্ছি বাবু, সে জায়গাটা কেমন? দোকান পত্তর থাকবে? আপনাদের তো না হয়

একটা ব্যবস্থা হবে, কিন্তু আমাদের যদি থাকতে হয় তো খাওয়া দাওয়ার কথাটাকে দেখে নিতে হবে…'

মুখার্জী হো হো করে হেসে ওঠে—'বাঃ যাচ্ছ যেখানে সেখানে কি হয়েছে জানো তো—দুর্ভিক্ষ।'

বেয়ারা বলে 'আজ্ঞে সেই জন্যেই তো ভাবছি যে খাওয়া টাওয়া মিলবে কিনা…, তাড়াতাড়িতে পয়সাও নিয়ে আসিনি।'

মজুমদার একটা সিগারেটের পর আর একটা সিগারেট খেয়েই চলেছে একমনে।

ড্রাইভারটা পাশ থেকে বেয়ারাকে সায় দেয়। বলে 'আর পয়সা লিয়ে গেলেই কি খেতে পাবে নাকি? সেবার ওই সেন সাহেবের গাড়ি নিয়ে বাঁকুড়ার কোথায় গিয়েছিলাম বুঝলে। তো খুঁজে খুঁজে এক দোকানে খানিক মুড়ি জিলিপি কিনে খাব, তো দেখি চারিদিকে সব ন্যাংটো ন্যাংটো ছোঁড়া জুটে গিয়েছে—বাবু গো, দুটি খেতে দাও গো, বাবু গো—শালা ওর মধ্যে কি খাওয়া হয়? পয়সা থাকলেও খেতে পারা যায় না….'

কথার সূত্র ধরে উঠে পড়ে দুর্ভিক্ষের গল্প। ফটোগ্রাফার বলে, কোন মন্ত্রীর সঙ্গে সে যেন কোথায় সদরে গিয়েছিল। ও আশে পাশে ঘুরছে। তো লোকে এসে ওরই পা জড়িয়ে ধরছে। ভাবছে ওই বুঝি কিছু করতে পারবে। মাইরী! ভদ্রঘরের বৌ ঝিরা পর্যন্ত, মাইরী!

মুখার্জী বলে 'আর ভদ্র। খিদে বুঝলে হে, ভদ্র অভদ্র মানে না' বলে গল্প করে তার এক অভিজ্ঞতার কথা। সেবার সে কোন্ এক মন্ত্রীর সঙ্গে নাকি গিয়েছিল কি একটা উদ্বাস্তু অঞ্চল সফর করতে। মন্ত্রীরা কি একটা অনুষ্ঠানে ব্যস্ত তখন। সে একটু পায়চারি করছিল আশে পাশে। তো হঠাৎ দেখে কোন্ সময় হ্যাংলা হ্যাংলা এক পাল ছেলেমেয়ে বুড়োবুড়ী এসে দাঁড়িয়েছে। ও একটা কমলা খাচ্ছিল তার দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে আছে। তো সত্যিই ওর কষ্ট হল। পকেট থেকে কয়েকটা পয়সা নিয়ে ছুঁড়ে দিয়েছিল ছেলেগুলোর দিকে। পয়সা কুড়াবার জন্যে চারিদিকে কী হুড়োহুড়ি! হঠাৎ দেখে একটা কচি ছেলেকে ধরে হিংস্রভাবে কিল চড় মেরে চলেছে এক ছেঁড়া কোট

পয়! বৃদ্ধ 'তুই আমারডা নিবি ক্যানে? আগে আমি দৌড় দেই নাই!' বোঝা গেল পয়সা কুড়াবার হুড়োহুড়ির মধ্যে ওই বুড়োটাও এসে জোটে ছেলেগুলোর সঙ্গে। একটা পয়সা পড়ে থাকতে নাকি বুড়োটা আগে দেখেছিল। কিন্তু ছেলেটার সঙ্গে দৌড়ে পারেনি। সে আগে তুলে নিয়েছে। মুখার্জী বলে, 'কিন্তু জানেন মিঃ মজুমদার, ওদের ছাড়িয়ে দিতে গিয়ে হঠাৎ চমকে উঠলাম। বুড়ো লোকটা আমার চেনা। আমাদেরই গাঁয়ের স্কুলের হেডপণ্ডিত। আমাকেও পড়িয়েছিল···· বুঝলেন মিঃ মজুমদার আমি জিজ্ঞসাবাদ করে যেই বললাম, আমি আপনাকে চিনি, অমনি আঁতকে এমন সাদা হয়ে গেল বেচারার মুখটা। হঠাৎ সজোরে ঘুরে দাঁড়িযে ক্ষেপার মত নিজের কপাল চাপঁড়াতে চাপড়াতে চলে গেল ক্যাম্পটার দিকে·· '

মজুমদার আর একটা সিগারেট ধবিয়ে হঠাৎ বলে—'গল্পটা ঠিক। কিন্তু সত্যিই কি পয়সা ছুঁড়ে দিতে পেরেছিল মুখার্জী? নিজের পয়সা তো?'

সকলে হা হা করে হেসে ওঠে। সত্যিই এমন মজার কথা বলতে পারেন মজুমদার। এমন রসিকতা করতে পারেন। সরকারী প্রচার বিভাগের অত বড় একটা অফিসার কিন্তু এমন মিশতে পারেন অন্যান্য কর্মচারীদের সঙ্গে।

হাসির পর ফটোগ্রাফারটা কি ভেবে আবার বোকার মত বলে 'যাই বলুন, আমি তো ভাবতেই পারি না যত কষ্টই হোক, অমন হ্যাংলামি মানুষ কেমন করে করতে পারে!'

গাড়ি ছুটছে। রাস্তার মোড়ে দাঁড়ানো ট্রাফিক পুলিসের পর্যায়ও শেষ হয়ে গেছে। শহরতলী আর কারখানা অঞ্চল শেষ হয়ে শুরু হয়েছে গ্রামাঞ্চল, এলোমেলো ক্ষেত আর গাছ। গাছ আর ক্ষেত। তার কিছুটা সবুজ হয়তো ফসলের জন্যে। কিছুটা সবুজ হয়তো শুধুই আগাছার জন্যে। সবুজ ঘাস, সবুজ আগাছা, জলাভর্তি সবুজ পানা।

এরই মাঝে মাঝে বসতি পড়ে দু-একটা। উদ্বাস্তুদের ভাঙাচোরা কুঁড়ে। তার মধ্যে ঘরকন্না গেরস্থালির দীন চেহারাটা কয়েক মুহূর্তের

জন্য চোখে পড়তে না পড়তেই গাড়ি এগিয়ে যায়। মাঝে মাঝে আসে গ্রাম। এক আধটা কোঠা। আলকাতরা মাখা পুরনো কেরোসিন টিনের চাল নামা দোকান ঘর। বট গাছের গুঁড়িতে মারা কবিরাজী ঔষধালয়ের সাইন বোর্ড। পুরানো জমিদার বাড়ির পলেস্তারা ওঠা দেওয়ালের গায়ে আধছেঁড়া বিবর্ণ জওহরলালের মুর্তি। ছাপা পোস্টার অনেক কাল আগে ভোটের সময় লাগান হয়েছিল বোধ হয়, এখনও টিকে আছে বিবর্ণ হয়ে। মাঝে মাঝে এক একটা পুকুর ঘাট।

হ্যাংলামি নিয়েই আরো কি একটা কথা হচ্ছিল যেন। মজুমদার কথা থামিয়ে মোটরের জানলা দিয়ে দেখতে থাকে। মোটরটা এগিয়ে গেলে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়েই দেখতে থাকে। মোটর আরো এগিয়ে গেলে দেখতে থাকে মুখটা ঘুরিয়ে। পুকুরঘাটে মেয়েরা স্নান করছে। আলুথালু ভেজা কাপড়। তারপর হঠাৎ চকিতভাবে মাথা ঢুকিয়ে নেয় গাড়ির মধ্যে। চকিতভাবে একবার তাকিয়ে দেখে মুখার্জী আর ফটোগ্রাফারের দিকে। না ওরা কেউ লক্ষ্য করেনি। তারপর কি ভেবে সীটে ঠেস দিয়ে বলে—'আহ্। কী সবুজ মাঠ দেখেছ! কী সবুজ! বাংলার গ্রামের এই সবুজ······রিয়েলি আই হ্যাভ্ এ প্যাশন ফর দি ফিল্ডস্!' মুখার্জী বলে—'আপনি তো একসময় কবিতাও লিখতেন না?'

মজুমদার আত্মতৃপ্তভাবে হেসে বলেন, 'না ট্রিপটা রিয়েলি প্লেজেণ্ট হবে। কলকাতা ভালো লাগে না হে···'

সামনের সীট থেকে বেয়ারাটা গুঁই গুঁই করছিল—'মরবে! মরবে!'

ফটোগ্রাফার জিজ্ঞেস করে, 'কি হে তোমার আবার কি হল?'

'মরবে। মরবে সব!'

'কেন?'

'দেখছেন না মাঠে কি লাগিয়েছে? পাট। ধান দেখছেন কোথাও? সবুজ তো বটে, কিন্তু সব পাট। না খেয়ে মরবে।'

ফটোগ্রাফার বলে 'তাই না বটে!' তারপর কি ভেবে হি হি করে হাসে—'তাতে তোমার ভাবনা কি বাপু। তোমার জমিও নয় পাটও

নয়। ধান হলেও তোমাকে সেই রেশন কিনে খেতে হবে, না হলেও খেতে হবে…'

ড্রাইভারটাও কলকাতায় আছে অনেক দিন। হয়তো কোন একদিন গ্রামে ছিল বোধ হয়। পেছনের দিকে না তাকিয়ে বলে—'তা বটে। কিনেই খেতে হবে আমাদের।…তবে কি জানেন, ধান তো লক্ষ্মী আছে কিনা, তাই….'

আবার একটা পুকুর ঘাট পড়ে। মজুমদার আবার মুখ বাড়ায়, তারপর সীটে হেলান দিয়ে সিগারেট ধরিয়ে বলে, 'কত মাইল এলাম ড্রাইভার? পঁচিশ? তাহলে এখনো দেড় ঘণ্টা।…রিয়েলি। আফটার অল্ এ প্লেজেন্ট্ ট্রিপ্…'

ঘ্যাঁচ্ করে কনভয়টা থেমে গেল হঠাৎ। সামনে কি হয়েছে বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু নিশ্চয়ই কিছু একটা হচ্ছে অথবা হবে। ক্যামেরার বাক্সটা বগলদাবা করে তাড়াহুড়া করে লাফিয়ে নামল ফটোগ্রাফার। সামনের কোন একটা গাড়ি থেকে হুড়মুড় করে নেমে পড়েছে সাংবাদিকদের দল। পকেট থেকে নোটবই আর পেন্সিল বের করতে করতে ছুটছে সামনের দিকে। আর একটা কোন গাড়ি থেকে নেমে ফিল্ম্ ডিভিশনের লোকটা ভারী মুভী ক্যামেরাটা নিয়ে 'পজিশন' নেবার চেষ্টা করছে। ঠোঁটের কোণে একটা সিগারেট লটকানো। একটা মোটরের ইঞ্জিনের ওপর পা দিয়ে উঠেছে স্টেশন ওয়াগনটার মাথায়। ক্যামেরার নলে চোখটা লাগিয়ে তাকিয়ে দেখছে সামনের দিকে।

ছবি নিতে হবে ছবি। বড় বড় ঘটনা যা ঘটবে—মন্ত্রীদের মহত্বের ঘটনা, জনসাধারণের প্রতি তাদের সহৃদয়তার ঘটনা, কর্তব্যপরায়ণতার ঘটনা তার ছবি নিতে হবে। সে ছবি সিনেমা ঘরে ঘরে দেখান হবে প্রচার বিভাগের তরফ থেকে। সরকারী দপ্তরে তার ষ্টিল থাকবে। মন্ত্রীদের বন্ধুরা সে ছবি চেয়ে নেবে! মন্ত্রীরা নিজেরা সে ছবি নিজেদের ঘরে টাঙাবেন। তা নিয়ে গর্ব করব না ভাবতে ভাবতেও গর্ব প্রকাশ করে ফেলবেন অন্তরঙ্গদের কাছে।

মজুমদারের ওপর সমস্ত সফরটার প্রচারের দিকটা ম্যানেজ করার ভার। তাই তাকেও নামতে হয়। সিগারেটের টিনটা খুলে অমায়িক ভদ্রতার হাসি হেসে তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায় সাংবাদিকদের দিকে 'এই যে স্যার····সিগারেট নিন। আপনাদের কোন অসুবিধা হচ্ছে না তো ?'

সাংবাদিকদের নিজেদের মধ্যে তখন প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেছে। যে ঘটনা ঘটবে তার সবচেয়ে ভালো 'স্টোর' কে মারতে পারে, তার প্রতিযোগিতা। বিরক্ত হয়ে একবার পেছন দিকে তাকিয়ে দেখে মজুমদার। তারপর বিনা বাক্যব্যয়ে সব কটি সিগারেট লুট করে নিয়ে আবার তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায় সামনের দিকে।

মজুমদার খালি সিগারেটের বাক্সটা পকেটে রেখে অন্য পকেট থেকে আর একটা কৌটো বার করে। তা থেকে সিগারেট ধরায়। বেয়ারাটার দিকে চেয়ে বলে—'ওহ্ এই সব সাংবাদিক! শেষ পর্যন্ত কাগজে কি যে লিখবে তা ঈশ্বরই জানেন। ভাগ্যিস এই কৌটোটা অন্য পকেটে সরিয়ে রেখেছিলাম। নইলে এটাকেও সাবাড় করে দিত ঠিক····'

সামনের কোন একটা গাড়ি থেকে মিঃ সেন আসে, 'মজুমদার, দাও কিছু সিগারেট···আমার গুলো ফুরিয়ে গেছে।' মজুমদার বলে, 'সে কি ?'

'বাবা সরকারী সিগারেট ফুরালেও তোমার অস্বস্তি····' বলে খাবলা মেরে সিগারেট খানিকটা নিয়ে যায় 'আমি আবার এমন এক ধকলে পড়েছি····'

মজুমদার নিজের সিগারেট কেসটি বার করে আর একটা টিন কেটে তা ভর্তি করে আলাদা করে পকেটে ঢোকায়। তারপর কাটা টিন থেকে সিগারেট নিয়ে ধরায়। ফটোগ্রাফার ফিরে আসে খবর নিয়ে 'ধ্যৎ! কিছুই নয়।'

ডাব। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী দিল্লীতে থাকেন। ডাব তো চাখেন না। রাস্তায় যেতে যেতে গাছে ডাব দেখে হঠাৎ তেষ্টা পেয়ে গেছে। তাই গাড়ি থামিয়ে বিনা পয়সার ডাব খেয়ে নিচ্ছেন।

ফিল্‌ম্‌ ডিভিসনের লোকটা গাড়ির ছাতে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ অন্য লোকের পোজগুলোর ছবি নেবার চেষ্টা করছিল। এখন নিজেই পোজ নিয়ে ঘুরে দাঁড়ায়—'হোয়াট! ডাব?…আই সি…'

গাড়ি চলতে আরম্ভ করেছে আবার।

ফটোগ্রাফার এতক্ষণও কোন সিগারেট চায়নি। এবার একটা সিগারেট চায় মজুমদারের কাছে—'দিন স্যার একটা খাই। সরকারী পয়সা যখন…'

মজুমদার বিরস মুখে একটা সিগারেট দিয়ে নিজে আর একটা ধরায় তারপর বলে—'কিন্তু ওই জার্গালস্টগুলো কি রকম হ্যাংলা দেখলে তো? ভাগ্যিস কিছু রেখেছিলাম আলাদা—'

চলন্ত গাড়িটাকে হঠাৎ থামিয়ে ছুটে আসে মিঃ সেনের আর্দালী। 'কি ব্যাপার?'

'মিঃ সেন পাঠিয়ে দিলেন। তিনি মন্ত্রীদের গাড়িতে আছেন। তাই এগুলো আপনাদের গাড়িতে নিয়ে নিন্‌। ফেরার সময় সাহেব নিজের গাড়িতে নিয়ে নেবেন।'

সেই ডাব। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর খাওয়ার জন্যে গাদা গাদা ডাব পাড়া হয়েছিল। নষ্ট হবে তাই তারই এক বস্তা মিঃ সেন নিয়ে যাচ্ছেন। আর্দালীটা হাসল—'কলকাতায় তো এমন ভালো ডাব মিলবে না, তাই সাহেব বললেন—'

মজুমদার অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলে বসল, 'কিন্তু আমাদের ভাগ?'

আর্দালীটা চলে গেল আবার সামনের গাড়িতে। 'সে আপনারা সাহেবের সঙ্গে বুঝবেন…'

মজুমদার আর একটা সিগারেট ধরাল, 'জানলে মিঃ মুখার্জী, সেন একটা হরিব্‌ল্‌ ক্রীচার হয়েছে। বিনা পয়সায় ডাব তো ডাবই সই।'

মুখার্জী সামনের দিকে তাকিয়ে কি ভেবে উদাসভাবে বলে—'আমাদের ডিপার্টমেন্টটা জানো, এর কোন ভবিষ্যৎ নেই। অন্য অন্য জায়গায় কত সুবিধা। এই তো চক্রবর্তী দেড় বছরের মধ্যে কটা বাড়ি কিনেছে জানো? তিনটে…'

মজুমদারও কেমন বঞ্চিত বোধ করে নিজেকে। মনে হয়, সত্যিই তাদের ওপর যেন একটা বিশেষ অন্যায় হয়েছে। বলে—'ঠিক! এই যে মন্ত্রীরা···আমরা জানি না কি হয়? আমাদের হাত দিয়েও তো আর কম লেনদেন হয়নি। দেখেছি তো। আসল কথার বেলায় ঢন্ ঢন্। ওহ্ পাবলিসিটি! সে বেলায় ওদের তো অন্য কাজ। শালা এ ডিপার্টমেণ্টের টপে না যেতে পারলে কোন সুবিধা নেই।'

গাড়ি বেঁকে। পুকুর ঘাট পড়ে একটা। মেয়েরা স্নান করছে, কিন্তু মজুমদার ফিরেও তাকায় না। অকপট দুঃখে আপন মনে বলে 'কী জীবন! কেবল লাগানি ভাঙানি। পাবলিসিটি, যতই পাবলিসিটি করো তাতে কি আর কাজ হয়? অথচ ওদের ধারণা কেবল আমাদেরই দোষ। কোন প্রস্‌পেক্ট নেই এখানে···'

এসে গেছে।

মুখার্জী নামতে নামতে বলে 'তাহলে এবার দুর্ভিক্ষ····'

মজুমদার তাড়াতাড়ি তার কোট, টুপি, সিগারেটের টিন সংগ্রহ করতে করতে লাফিয়ে নামে—'হাঁ, এসে গেছি! এখানে খানিকটা হল্ট করে তারপর লঞ্চে বাইশ মাইল। বিকেলের আগেই আবার ফিরতে হবে। হারি···' বলতে বলতে মজুমদার ছুটল সামনের দিকে। এবার তার কাজ শুরু। গাড়িগুলো যেখানে গিযে থেমেছে, সেটা মফস্বল থানা। কিন্তু হঠাৎ গাড়ি থেকে নেমে বোঝা যায় না। থানা ভর্তি হয়ে আগে থেকেই অনেক প্রাইভেট গাড়ি আর জীপ এসে হাজির হয়ে ছোট্ট থানাটাকে প্রায় আবৃত করে ফেলেছে। অধিকাংশ গাড়ি এবং আরোহীই বাইরে থেকে এসেছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর দুর্ভিক্ষ অঞ্চল পরিদর্শনের সুযোগে সাক্ষাৎ করতে। শুধু ক্ষুদে থানাটার অবহেলিত সেপাইরা হঠাৎ সেজেগুজে একমনে একজায়গায় দাঁড়িয়ে মার্চ করছে, সেল্যুট দিচ্ছে। কাকে দিচ্ছে, কে মন্ত্রী, মন্ত্রী আদৌ ওদের দিকে দেখছে কিনা, তা বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু তাতে তাদের কর্তব্যের এতটুকু ত্রুটি হবার জো নেই।

কারণ মন্ত্রীরা না দেখলেও কম্যাণ্ডিং অফিসার সতর্ক নজর রাখছেন।

সপারিষদ মন্ত্রী, কমিশনার, ম্যাজিস্ট্রেট, এস-ডি-ও, সার্কেল অফিসার, এম-এল-এ, পরাজিত এম-এল-এ, কংগ্রেস সভাপতি, হবু উপমন্ত্রী, হবু সেক্রেটারী—হুড়মুড় করে আসা বিরাট আগন্তুক দলটায় এক মুহূর্তে পূর্ণ হয়েছে ক্ষুদে ডাক বাংলোটা। ঘেঁষাঘেঁষি ঠেলাঠেলি! এক অপূর্ব হরির লুটের ভিড়। কে কাকে ঠেলে আগে যাবে, কে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর চোখে আগে পড়বে, ক সব চেয়ে সুবিধাজনক জায়গায় গিয়ে দাঁড়াবে তার জন্যে কাড়াকাড়ি। পুলিস দলটাকে ডিসমিস করে অফিসার কম্যাণ্ডিং দৌড়তে দৌড়তে আসেন, পাছে প্রতিযোগিতায় তার একটু বেশি দেরিই বা হয়ে যায়। পথে ধাক্কা লাগল একটা বাবুর্চির সঙ্গে। কিন্তু কী আশ্চর্য অত বড় জঁাদরেল পুলিস অফিসার কোনরকম মেজাজ দেখাল না! কারণ বাবুর্চিটার হাতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর জন্য কমলালেবুর সরবত। ভিড়ের মধ্যে মুখার্জী রুখে উঠল একটা লোকের ওপর 'কী মশায় ঠেলছেন কেন অমন করে?'

লোকটা মুখ কাঁচুমাচু করে চাইতেই মুখার্জী টের পেল—ও হরি, ইনি যে কমিশনার সাহেব!

এই অজ পাড়া গাঁয়ের মধ্যেও কোথা থেকে যেন ঠোঁটে রঙ মাখা এক প্রৌঢ়া ভদ্রমহিলা এসে জুটেছেন। কোন অফিসারের স্ত্রী কিংবা কোন দেশসেবকের জননী কে জানে? তিনি মাঝে মাঝে মোহিনীর ভঙ্গিতে কোঁচকানো চামড়াগুলোকে আরো কুঁচকিয়ে মৃদু হাসছেন। ভাবছেন হাসি দেখে কেউ বুঝি পথ ছেড়ে দেবে। কিন্তু কেউ দিচ্ছে না দেখে কিছুক্ষণ পরে কনুয়ের গুঁতো মেরে পথ করার চেষ্টা করছেন। ব্যর্থ হয়ে আবার হাসছেন। ভিড়ের মধ্যে দেখা গেল ফটোগ্রাফার মেজাজ দেখিয়ে চিৎকার করছে—'কি পেয়েছেন কি আপনারা? আমায় কাজ করতে দেবেন না। ফটো তুলতে দেবেন না আমাকে? কি পেয়েছেন কি আপনারা?'

ভিড়ের মধ্যে ফটোগ্রাফার তড়পাচ্ছে, মেজাজ দেখাচ্ছে, ঘুঁষি মারছে। সে ঘুঁষি খেয়েও একজন ফুড কমিশনার একজন প্রাদেশিক উপমন্ত্রী ও একজন পুলিস অফিসার একটুও মেজাজ দেখাল না। মুখ কাঁচু মাচু

করে পথ ছেড়ে দিল। আর সবচেয়ে মেজাজ দেখাতে শুরু করল বাবুর্চিটা। স্ত্রী, পুরুষ, প্রাদেশিক মন্ত্রী, মন্ত্রী, হবু মন্ত্রী, পুলিস সুপার, পাবলিসিটি চীফ—প্রত্যেককে সমানে ধাক্কা মারতে মারতে গালাগালি দিতে দিতে সে ছুটাছুটি করছে। এবং কী আশ্চর্য কেউ অপমানিত বোধ করছে না, কেউ প্রতিবাদ করছে না! কারণ, কমলালেবুর সরবতের পর বাবুর্চির হাতে ট্রেতে করে চলেছে ওঁর ব্রেক্‌ফাস্ট্। গাড়িগুলো থামার সঙ্গে সঙ্গে যে কলরব শুরু হয়েছিল তা থামেনি। উচ্চ কলরবটা হঠাৎ একসময় চড়ে উঠল এক উচ্চতম কলরবে।

'এই যে। এই যে! এখানে একটা ডিস্!'

'এখানে, এখানে।'

'কই আমি পেলুম না যে এখানে। ও মশায় কই আমার ভাগের ডিস কই?'

মুখার্জী ছুটাছুটি করছে যন্ত্রের মত। ফিল্ম্ ডিভিশনের ক্যামেরা-ম্যানের মুখে একটা মুর্গীর ঠ্যাং অর্ধেক ভেতরে অর্ধেক বাইরে। ওই অবস্থাতেই সে চিৎকার করছে—'আমাদের কমলালেবু কই? ব্যাড., আই সে ভেরী ব্যাড্...' ঠোঁটে রংমাখা ভদ্রমহিলা কাতর হয়ে ঘুরছেন, 'আমি চা পাইনি কিন্তু। কই আমার চা কই?'

'কই আমার খাদ্য কই' চিৎকার উঠছে চারিদিক থেকে। কিন্তু যারা চিৎকার করছে তারা এমন ভাব দেখাচ্ছে যেন সে চা পায়নি সে কথাটা হঠাৎ মনে পড়ে গেছে মাত্র। অন্য গুরুতর কথা আলোচনা করতে করতে হঠাৎ মনে হয়েছে ডিসটা এদিকে আসেনি কেন, হঠাৎ মনে হয়েছে লঞ্চ ছাড়ার সময় হল অথচ ব্রেকফাস্টের ব্যাপারটা নিয়ে এত বেবন্দোবস্ত হচ্ছে কেন—এই মাত্র।

মজুমদারের ওপর তদারকের ভার। সকলেই এসে মুখ খিঁচোচ্ছে, মজুমদার নিজে একটা ডিস দখল করে কোন উত্তর না দিয়ে গোগ্রাসে সেটাকে শেষ করে চলেছে। তারপর বাকি জিনিসগুলো তাড়াতাড়ি পকেটে পুরে ভরা মুখেই মুখ খিঁচিয়ে উঠল কনট্রাক্টরের ওপর—

'পঞ্চাশটা ব্রেকফাস্ট আর পঞ্চাশটা লাঞ্চের অর্ডার ছিল তো কেন কম পড়বে? কেন কম পড়ছে তার জবাব দিন—'

একটা বাবুর্চি তাড়া খেয়ে কার জন্যে যেন চা নিয়ে যাচ্ছিল। ফুড কমিশনার অন্যলোকের সঙ্গে কথা বলতে বলতেই গপ করে মাঝ পথ থেকে তা টেনে নিলেন। কনট্রাক্টর একটা ডিসে ছুটো কমলালেবু নিয়ে ছুটছিলেন কার জন্যে। মুখার্জী কি একটা লিখতে লিখতেই বোঁ করে একটা তুলে নিল। একজন হবু উপমন্ত্রী একটি কাপ দখল করে চুমুক দিতে যাবেন, এমনি সময় মজুমদার ঝাঁ করে সেটা টেনে নিল— 'দিস্ ইজ ব্যাড্। পাবলিসিটি ফার্স্ট। একটু অপেক্ষা করবারও তর সইছে না আপনাদের?' বলে ধমক দেন একজন স্থানীয় কংগ্রেস সভাপতিকে। তারপর আর আবার সোরগোল উঠল—'লঞ্চ। সময় নেই লঞ্চ ছাড়বে এক্ষুনি। বিকেলের মধ্যেই ফিরতে হবে মনে থাকে যেন…'

আসছে! আসছে!

রোদে-পোড়া থই থই লোনা জলের গাঙের বাঁকে দেখা দিয়েছে তিনটে মোটর লঞ্চ। সামনেরটায় পুলিসবাহিনী—মন্ত্রীকে পাহারা দিয়ে আসছে। পেছনে মন্ত্রী ও মান্যগণ্যেরা। তার পেছনে সাংবাদিক ও কর্মচারীরা। লোনা বাতাসে পত্ পত্ করে উড়ছে অশোক চক্র। আসছে! আসছে!

ক্ষুধার্ত মলিন ভিড়টায় হঠাৎ এক অসহ্য চাঞ্চল্য জাগে। কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ায় সবাই। কাঙালপনা প্রকাশ করব না ভাবতে ভাবতেও কাড়াকাড়ি লাগে। মানিকের তদারক সত্ত্বেও কানার মত অনিশ্চিত ভাবে সকলেই এগিয়ে গিয়ে এমন একটা জায়গা নিতে চায়, যেখানে সবচেয়ে আগে তাকে চোখে পড়বে, নাম লিখতে হলে তার ভাগেই আগে চাল পড়বে। টুকির কাঁধে হাত রেখে বুড়ীটাও উঠে দাঁড়ায়। থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে অনিশ্চিত ঝাপসা চোখে বার বার জিজ্ঞেস করে, 'হাঁরে, ওরা এল নি?'

'ওই তো আসতেছে…' টুকি বলে ফিস ফিস করে।

সত্যিই ওরা এসে গেছে। লঞ্চ, পতাকা, পুলিস—তারপর ওরা। ওদের মধ্যে কে মন্ত্রী, কে সব চেয়ে বড়, কার হাতে মানুষ বাঁচাবার ক্ষমতা কে জানে। কিন্তু ওরা এসেছে। চারিদিককার কালচে ধুসর পরিমণ্ডলের মধ্যে কী আশ্চর্য সাদা ধবধবে পাঞ্জাবী; কী শান্ত অমায়িক হাসি, খাদি টুপির ইস্ত্রির ভাঁজে কী শুভ্র ছটা। সাদা চুলে কী নরম আশ্বাস। মন্ত্রের মত ধ্বনি তুলে তুলে ওরা কথা কইছে। কোন্ ভাষায় কথা কে জানে। কি বলছে কে জানে। কিন্তু দবে, নিশ্চয়ই দেবে···কয়েক মুহূর্তের জন্য কি হচ্ছে, কি বলছে, কেন হাত নাড়ছে, কিছুই বুঝতে পারছে না টুকি। শুধু দেখল ওরা এল, ওরা নামল, ওরা হাত নেড়ে কি বলল, অন্য লোকেরা কি বললে, কি চিৎকার করলে। তারপর আবার ওরা চলে যাচ্ছে।

চলে যাচ্ছে! সে কি চাল দেবে না? চাল না দিয়ে চলে যেতে পারে কখনো? এতদূর এসে আবার এখুনি ফিরে যেতে পারে কখনও? এখনো ওঠেনি, এখনো ঘাটেই আছে। এখনো আশা আছে। এখনো দৌড়িয়ে গিয়ে যদি পা জড়িয়ে ধরে, যদি আকুল মিনতি করে কাঁদে, তবে কি ওদের দুঃখ না বুঝে পারবে, তবে চাল না দিয়ে পারবে? থর থর করে কাঁপতে থাকে বুড়ী। কাঁপতে থাকে টুকি। টুকি ফিসফিস করে বলে, 'দিদি, আমাকে ধরিস, পারবনি·······'

যারা এসেছিল ধীরে ধীরে আবার চলে যেতে শুরু করে তারা। মাঠ, বাদা পেরিয়ে দূর দূর গ্রাম হতে যারা এসেছিল, তারা আবার রওনা দেয় ঘরের দিকে। যেতে যেতে মাঠে নেমে চেঁচোর মূল খুঁজতে থাকে কেউ। কেউ কোঁচড় ভরে জোগাড় করে গাব গাছের পাতা। এখানে ওখানে দু-একজন গাল দিতে দিতে যায় 'চাল দিবেনি তো এয়েছ কেন? মাগীগুলার পাছা দেখার জন্যে এয়েছ·······'

মানিক একটা ছেঁড়া ন্যাকড়া লোনা জলে ভিজিয়ে এনে মাথায় জল দেয় বুড়ীটার। বুড়ীটা ভিরমি খেয়ে পড়ে আছে। মানিক বুড়ীটাকে

ধরাধরি করে এনে শুইয়েছে আম গাছটার তলায়। টুকি কাঁদছে কপালে করাঘাত করে, 'হেই দিদি তুই মরে যাবি, চোখ মেল...'

ঝাপটা মারতে মারতে চোখ মেলে বুড়ীটা। উদ্‌ভ্রান্ত চোখে তাকায়। তারপর ফিসফিস করে হাঁপাতে হাঁপাতে বলে 'তোর কথা রেখেছি মানিক। পা ধরি না ওদের। পেটের জ্বালা বড় জ্বালা মানিক, কিন্তু পা ধরি না..... '

মানিক সর্দার চমকে তাকায় এই কঙ্কালসার বুড়ীটার দিকে। তারপর বলে—'না ধরো নি, কেউ ধরেনি।' মানিক সর্দারের ক্ষুধিত কঠিন দুই চোখ থেকে টপ টপ করে জল পড়ে দুই ফোঁটা।

সূর্য অস্ত যাচ্ছে। ফ্যাকাশে কালচে আকাশটার জায়গায় জায়গায় মেঘের আঁচড়গুলো লাল হয়ে উঠেছে। আম গাছটায় লাল আলোর ছোপ।

দেয়ালের এখানে ওখানে, পরতে পরতে পুরানো কাটল আর সিঁদুরের শুভচিহ্ন।

এই ঘরের মধ্যে পরদেশীয়া আছে অনেকদিন ধরে। কতদিন তা পরদেশীয়া জানে না।

জানেনা তার নিজের বয়স আর পরিচয়। কে তার বাপ ছিল—কে তার মা তা পরদেশীয়ার মনে নেই। কোন জিলা থেকেই বা তারা এসেছিল বাংলায় কে জানে? কিন্তু তারা যে বাংলার বাইরে থেকে এসেছিল, এবং কলকাতার শ্রমিক অঞ্চলের কোনো একটা বস্তিতেই যে পরদেশীয়ার জন্ম তার প্রমাণ শুধু ওর ওই নাম, পরদেশীয়া।

চটকল এলাকার চারিদিকে তারপর পরিবর্তন হয়েছে আরো। বস্তির গায়ে গায়ে ঠেলে উঠেছে বস্তি। নোংরা খোলা ড্রেনের উপরে জমেছে ময়লার পর ময়লা। খানা ডোবার আবদ্ধ পচা জল সবুজ বুদ্‌বুদে ঘন হয়ে এসেছে বছরের পর বছর। ছাইগাদার ময়দানে ঘাস নিঃশেষ হয়ে ছাইয়ের ফ্যাকাশে রঙটা যেন ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে। দালান যা উঠেছে তা প্রায়ই নতুন মিল অথবা পুরনো মিলেরই নতুন সম্পত্তি। লোক এসেছে নতুন নতুন। ঘটনা ঘটেছে, বড়ো বড়ো ঐতিহাসিক ঘটনা।....'৩৭ সালের ফেটে পড়া বিক্ষোভ, রাস্তা জুড়ে '৪৬ সালের সাধারণ ধর্মঘটের জোলুস, চাঁদোয়া খাটিয়ে মহল্লায় মহল্লায় আলো আর মাইকের বাজনায় আজাদী ঘোষণার উচ্ছ্বাস; তারপর আবার চলেছে এক নাগাড়ে ছাইরঙা প্রাত্যহিক মেহনতের মিছিল।

সেই মিছিলে নিয়মিত দেখা যায় পরদেশীয়াকে। কাঁচা পাকা চুলে ভরা মাথার উপর কালো রঙের তালিমারা শাড়ির আলগা ঘোমটা, চ্যাটালো সবল দেহের ওপর পুরুষ মানুষের সার্টের মত তিন চারটে পকেটওয়ালা একটা কুর্তা, মোটা মোটা গোছওয়ালা পায়ের ওপর ভরুণের একজোড়া মল।

কারখানার বাঁশী বাজার আগেই পরদেশীয়া তার ঘরদোর পরিষ্কার করে, নাস্তা করে, ছাগলটিকে পালা খেতে দিয়ে বেঁধে রাখে খুঁটির সঙ্গে। তারপর বাঁশী শোনার জন্যে অপেক্ষা করে। বাঁশী বাজা মাত্র

আঁচলের চাবি দিয়ে তালা দেয় তার ঘরটিতে। যাবার সময় সামনের খাটালের লোকগুলোকে বলে যায় ছাগলটাকে যেন দেখে। তারপর রওনা দেয় চটকলের দিকে।

এমনি একলা নিঃসঙ্গ জীবন ছিল পরদেশীয়ার। শুধু মাঝে মাঝে মাত্র কিছুদিনের জন্যে ভাঙত তার একাকীত্ব। হঠাৎ দেখা যেত পরদেশীয়া তার অন্ধকারপ্রায় ঘরখানাকে ঝাড়পুছ করতে শুরু করেছে। আপন-মনে কার সঙ্গে যেন কথা বলে চলেছে অনবরত।

লোকে তার ঘরে উঁকি না দিয়েই বলত—এসেছে, নয়া আর একটাকে জরুর নিয়ে এসেছে জুটিয়ে।

জানা সত্বেও যারা কৌতূহল চাপতে না পেরে উঁকি দিত, তারা নির্ঘাত দেখত, ঠিক! আর একটি নতুন বছর দশ এগার বয়সের বোকা বোকা চেহারার ছোঁড়াকে জুটিয়ে নিয়ে এসেছে পরদেশীয়া। দাওয়ার উপর পরিপাটী করে একটি পিঁড়ি পেতে দিয়েছে বসতে। একটি ছোট কিন্তু চওড়া যে কাঁসার থালাটা সাধারণত তোলা থাকত, সেটি বার হয়েছে। তাকে মেজে ঘষে চকচকে করে ছাতু মেখে খেতে দিয়েছে ছোঁড়াটাকে। নিজে সামনে বসে আপন মনে অনবরত উপদেশ দিয়ে চলেছে নানা রকম।

দরদ দেখিয়ে বস্তির কোনো মেয়ে যদি জিগ্যেস করত—'পরদেশীয়া এটিকে কবে পেলে?'

তবে আর কথা নেই। পরদেশীয়া যেন এই রকম একটা প্রশ্নের জন্যেই অপেক্ষা করত। প্রশ্ন শোনা মাত্র হাত নেড়ে, তার স্বাভাবিক কর্কশ গলার স্বরটা যথাসম্ভব নরম করে বলতে শুরু করত সমস্ত ঘটনাটা। 'আহা, ছেলেটিকে ত দেখেছ, কেমন মুখ, কেমন চোখ। কিন্তু কেউ নেই বেচারীর, না বাপ আছে, না মা আছে। এখানে ওখানে ঘোরে। আমি রোজ চটকল যাবার সময় দেখি। নিজে থেকে কিছু বলেনা। আমি একদিন ডেকে জিগ্যেস করলাম। তা এমন মিষ্টি করে তার সমস্ত দুঃখের কথা বললে যে আর পারলাম না বহিন। ওকে নিয়ে এলাম ঘরে। থাক্, বেটার মত থাকবি, আমাকে মা ডাকবি,

সৎপথে থেকে জোয়ান হয়ে উঠবি, থাক আমার কাছে'—বলে গভীর দরদভরা চোখে তাকাত ছোঁড়াটার দিকে।

কিছুদিন সমানে চলত পরদেশীয়ার হঠাৎ-জাগা মাতৃস্নেহের উচ্ছ্বাস। ভোরে বাঁশীর আগেই টেনে তুলত ছোঁড়াটাকে। নিজ হাতে ধোয়া পাকলা করে শস্তা মনিহারী সাবান ঘসে ঘসে সমাধা হত স্নান পর্ব। তারপর আগের রাতের রান্না রুটি শাকের নাস্তা দিয়ে ছেলেটাকে বসিয়ে নিজে চলে যেত চটকলে। যাবার সময় বার বার পেছন ফিরে উপদেশ দিয়ে যেত, ভালো হয়ে থাকিস, ছাগলটাকে দেখিস, ডালগুলো রোদ্দুরে শুকিয়ে রাখিস, এমনি নানা কথা। শিফটের পর এসে আবার চলত নতুন পাওয়া বেটাকে ঘিরে সাংসারিক কাজের ব্যস্ততা।

তারপর আর একদিন হঠাৎ শোনা যেত পরদেশীয়ার গলা থেকে সাময়িক দরদের নরম আমেজটুকু উঠে গেছে। কর্কশ পুরুষালী কণ্ঠে অশ্লীল গালাগালি দিতে শুরু করেছে ছোঁড়াটার উদ্দেশে।

পড়শী মেয়েদের মধ্যে কেউ যদি দরদ দেখিয়ে জিগ্যেস করত, কি হয়েছে পরদেশীয়া? তবে আর কথা নেই। পরদেশীয়া সালঙ্কারে বলতে শুরু করত তার পোড়াকপালের কথা। যতো বেজাতের বদ-জন্মের ছোঁড়ারাই এসে জোটে তার ভাগ্যে। ছিঃ ছিঃ থুঃ থুঃ, ছোঁড়াটাকে মায়ের মত ভালবেসে ছিল পরদেশীয়া। দু'তিন বরিষ খাইয়ে দাইয়ে মোটা করল। দেখতে দেখতে মরদ হয়ে উঠল। লেবার বাবুকে ঘুষ দিয়ে কলে কাম পর্যন্ত জুটিয়ে দিল। কিন্তু কে জানত যে ও ছোঁড়াটা এমনি ভেড়ী, এমনি হারামী।

ঘটনাটা ঘটেছিল এই—কলের এক সর্দার সেদিন নাকি অপমান করেছিল পরদেশীয়াকে। অপমান মানে—কুৎসিৎ প্রস্তাব করেছিল। পরদেশীয়া রুখে গেলে ছোট সাহেব চোখ কুঁচকে হি হি করে হেসেছিল। কিন্তু এখন তো আর পরদেশীয়া একলা নয় যে, কেউ তাকে এমনি অপমান করবে। তার এখন এক জোয়ান বেটা হয়েছে। ছুটির পর পরদেশীয়া ভিড়ের মধ্যে থেকে খুঁজে খুঁজে বার করে ছোঁড়াকে। সব

ঘটনা বলে। অবলা মায়ের মত ছোঁড়াটার মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল—'এর একটা ফয়শলা কর বেটা…'

কিন্তু সর্দারের সামনে দাঁড়াতে সাহসে কুলায়নি ছোঁড়াটার। বলেছিল, 'ওতে কি হয়েছে। আর বেশি কিছু তো করেনি, তবে আর কি।'

বাস্! ওই কথা শোনার পরই এক মুহূর্তে পালটে গিয়েছিল পরদেশীয়া। ছোঁড়াটার কুর্তা চেপে ধরে হিড়্ হিড়্ করে টান্তে টান্তে নিয়ে এসেছে সারা রাস্তা। তারপর বাড়ি এসে একটা লক্ড়ি নিয়ে এলোপাথারি পিট্টি দিয়েছে ছোঁড়াটাকে। ছোঁড়াটা দু'একবার ঠেকাবার চেষ্টা করছিল, কিন্তু বলিষ্ঠ হিংস্র এই প্রৌঢ়া মেয়েটার সঙ্গে পারেনি। একলা পরদেশীয়া মহিষমর্দিনীর মত ছোঁড়াটার চুল ধরে, মারতে মারতে জন্মের মত তাড়িয়ে দিয়েছে ঘর থেকে। থুঃ থুঃ এমন ভেড়ী এমন হারামী সে জীবনে দেখেনি। না, ভেড়ীকে ভীতু কাপুরুষ কাউকে ছেলে বলে ভাবতে পারবে না। কি হবে সে বেটাকে নিয়ে, যে এই শক্ত দুনিয়াটার সঙ্গে লড়তে পারবে না, দুঃখী অপমানিত মাকে রক্ষা করতে পারবে না। মরদের মত মরদ হতে পারবে না? কিন্তু পরদেশীয়ার কপালই এমন যে তার মনোমত বেটা মিলল না কখনো।

চটকল এলাকার বিস্তীর্ণ ক্ষুধার্ত অস্থি জনসমুদ্রের এখানে ওখানে নিঃসঙ্গ আশ্রয়হীন বালকের অভাব হয়নি কোনদিন। কিছুদিন চুপচাপ থাকার পর হঠাৎ আবার এক একটাকে জুটিয়ে নিয়ে এসেছে পরদেশীয়া। কিন্তু কেউ টিকতে পারেনি। এক বছর ধরে কাক মায়ের মত এক একটা কোকিলের ছানাকে পেলেছে পরদেশীয়া। লোককে বলে বেড়িয়েছে যাক্ এবার সত্যিই একটা বেটার মত বেটা মিলেছে; আর কিছুদিনের মধ্যেই জোয়ান হয়ে উঠবে, মরদ হয়ে উঠবে। বিয়ে দিয়ে বহু আনবে ঘরে। চিরদিন কি আর ও কলে খাটবে ভেবেছ?

কিন্তু তারপর আবার ঘটেছে সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। কাউকে মেরে তাড়িয়েছে, কেউ বা নিজে থেকেই পালিয়েছে ভয়ে। কর্কশ হিংস্র গলায় চিৎকার করতে করতে পরদেশীয়া জানিয়েছে তার

দুর্ভাগ্যের কথা। দুর্ভাগ্যের ঘটনাগুলো পৃথক কিন্তু তাৎপর্য এক। কেউ গুণ্ডা হয়ে ওঠে, কিন্তু এদিকে ভয়ে হাঁটু খুলে আসে, কাউকে হয়ত পেলে পেলে বড়ো করল, কিন্তু দেখা গেল ভীতু ছোঁড়াটা একদিন নিজে থেকেই পালাল, পালাবার সময় কি ভাবে পরদেশীয়ার সমস্ত জমানো টাকাটাই চুরি করে ভেগেছে। আর এক বেটা শক্ত সমর্থ হয়ে উঠল বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটা বেশ্যা মাগীর ঘরে উঠে গেল পরদেশীয়াকে ফেলে রেখে। রাত্রে একদিন দেখা গেল কয়লাগাদার লাইনটার উপর কে একটা পড়ে আছে। যাকে দেখছে তাকেই ডেকে বলছে, 'জেরা শুনিয়ে। একঠো তার ভেজ্ দিল্লীয়েগা মন্ত্রীকে পাশ্। ওনকো আনে পরেগা ইধার।'

কুপীটা তুলে কাছে নিয়ে পরদেশীয়া দেখে মূর্তিমান আর কেউ নয় তারই লালিত বেটা। নেশা করে পড়ে আছে। 'হাঁ কেশব' বলে পরদেশী দুম্ দুম্ করে লাথি মেরে চলে এসেছিল থুথু ফেলতে ফেলতে।

সর্বশেষে যে ছোঁড়াটাকে পরদেশীয়া তাড়ায় সেটা তিনমাসও টেঁকেনি। হাবাহাবা ছেলেটা মাস তিনেক পরদেশীয়ার স্নেহ কাড়ার পর হঠাৎ একদিন ছোঁড়াগুলোর সঙ্গে মিশে রহস্য করে বলল স্বয়ং পরদেশীয়াকেই—'মায়ী আমাকে তোমার ব্যাটা করে নাও মায়ী।' বাস্, ওই শেষ। ছেলে পালার সময় যেমন স্নেহ উথলে উঠত পরদেশীয়ার তাদের তাড়িয়ে দেবার সময় তেমনি জেগে উঠত নিষ্ঠুরতা। এক একটা বেটাকে তাড়িয়ে দেবার পর আর কোনদিন তার নাম শোনা যায়নি পরদেশীয়ার মুখে। একফোঁটা চোখের জল ফেলেনি কোনদিন।

একটা জোয়ান মরদ বেটার মা হবার এই ব্যর্থ আকাঙ্ক্ষা শেষ পর্যন্ত শুধু একটা ঠাট্টার বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়াল। পরদেশীয়া নিজেও যেন হতাশ হয়ে উঠল।

পড়শীরা কেউ দরদ দেখিয়ে যখন বলত—'তোমার এতগুলো ব্যাটা। কেউ হয়তো অনুতাপ করে, ভালো হয়ে ফিরবে।'

পরদেশীয়া তখন ক্ষেপে উঠতো। 'ফিরবে? কেউ ফিরবে না। ফিরলে লকড়ি মেরে মুখ ভেঙে দেবো না?'

কেউ বলত, 'কই পরদেশীয়া, যা হয়েছে হয়েছে। আর কদ্দিনই বা বাঁচবে। এবার একটা ছেলেকে পুষ্যি নাও। ভালো হোক, মন্দ হোক ছেড়ো না।'

পরদেশীয়া মাঝে মাঝে ক্ষেপে উঠত—'না ও কাজ আর নয়।' মাঝে মাঝে আবার উদাস ভাবে চুপ করে থাকত। কিন্তু দীর্ঘদিন আর নতুন কোনো ছোঁড়া জুটিয়ে আনতে তাকে দেখা গেল না। ওকে নিয়ে রসিকতাও পুরনো হয়ে আসে ধীরে ধীরে। পরদেশীয়া ছাড়াই বিদ্রূপের মত বস্তু অনেক সুলভ হয়ে এসেছে চারিদিকে। রসিকতার মত মেজাজ কমে গেছে অনেক। চা-খানায় বসে বয়স্ক তাঁতীরা হাত দুলিয়ে দেখায়, দেখায়—'দেখো, কেতনে আঁদমীয়ো বাড় গিয়া।'

চিবিয়ে চিবিয়ে দু'একটা কথার উত্তর দেয় কেউ—'বস্তি বস্তি বেকার লোক ঘুরছে। আজ দেখেছিলে, বদলীওয়ালাদের কতো বড়ো লাইন হয়েছিল কলে?'

'বহুৎ খারাপ জমানা পড় গিয়া!'

স্পীনিংয়ের কয়েকটা ছোকরা দল বেঁধে আড্ডা দেয়। একটা শস্তা হিন্দী গানকে আরো বিকৃত করে গুণ গুণ করে। সঠিক সুরটা গলায় এলেও কেমন একটা দুর্বোধ্য আক্রোশে তাকে ইচ্ছা করে বাঁকিয়ে দেয়।

কেউ বলে, 'শালারা খারাপ পাট দিচ্ছে না কি মাইরী? কেবলি সুতো ছেঁড়ে?'

কেউ বলে, 'পাট ঠিক আছে, কিন্তু স্পীড বাড়িয়ে দিয়েছে যে!'

'দেখা নেহি, সাদা টোপী পিনকে শালা কেয়া নাম উনকা বোল গিয়া কি পয়দাবাড় বাড়াও।'

'হা পয়দাবাড় বাড়াও।'

ছোঁড়াগুলো শীষ দিয়ে তীব্র বিদ্রূপে হেসে উঠে—'ইয়ে আজাদী হ্যায় বাবা! বাত মাত করনা……

কেমন এলোমেলো ছেঁড়া ছেঁড়া দেখায় চটকল এলাকার নোংরা ধূসর জনস্রোত। তার মধ্যে অবাঙ্গালী মজুরের সঙ্গে এলোমেলো ঘুরে বেড়ায় উদ্বাস্তু আশ্রয়প্রার্থী। ছাইগাদার পোড়া কয়লা ঝরা বেছে তোলা বুড়ীগুলোর সঙ্গে এসে যোগ দেয় সক্ষম বেকার। খাটালের একটা গরু ক্ষিদের চোটে আপন মনে বস্তির পাতাগুলো চিবিয়ে খায়।

হঠাৎ আবার একদিন শোনা গেল পরদেশীয়ার কুঠরিটার ভেতর ব্যস্ত উদ্যোগ আয়োজন। আপন মনে কোমল সুরে পরদেশীয়া কাকে যেন উপদেশ দিয়ে চলছে অনবরত।

পড়শী মেয়েরা উঁকি দিতে এসে থেমে গেল—

'একিরে পরদেশীয়া! এতদিন পরে আবার?'

পুরুষালী মুখটায় হঠাৎ যেন এক লজ্জিত খুশির ছাপ লেগেছে। সুর করে বিনিয়ে বিনিয়ে পরদেশীয়া শোনাল তার সর্বশেষ বেটাটার কথা। 'হ্যাঁ বহিন! এটিকে আমি ভিখ্ মেঙ্গে নিয়ে এসেছি.......'

পড়শী মেয়েদের চোখে হঠাৎ কেমন দুর্বল মনে হয় এই নিষ্ঠুর একরোখা প্রাচীন মেয়েটাকে। কেমন একটা কাঙ্গালপণা যেন ফুটে উঠেছে পরদেশীয়ার ধূসর চোখ দুটোতে।

পড়শীরা সান্ত্বনা দিয়ে যায়, 'ভালো। বেটা না হলে মেয়েলোকদের আর কি সুখ! বেটা না থাকলে বুড়ো বয়সে কে দেখবে মেয়েকে!'

কেউ সন্দেহ প্রকাশ করে, 'তবে এই মাগ্‌গীর বাজারে আর একটা পেট বাড়ল। কামাই তো ওই তোরই যা......'

কেউ বলে—'তা এটাকে কবে তাড়াবি পরদেশীয়া?' একথা শুনলে অন্য সময় পরদেশীয়া চটে উঠত। অশ্রাব্য গালাগালি দিতে শুরু করত। কিন্তু এবার চটল না। ব্যথিত কাঙাল কণ্ঠে জানায়—'না বহিন্, এটাকে আর তাড়াব না। বদ হোক, চোর হোক, বদমাস হোক এটাকে রাখব...'

এবং সত্যি সত্যিই যেন তার সারা জীবনের বঞ্চিত স্নেহ নিয়ে পরদেশীয়া তার এই সবশেষের বেটাটাকে আঁকড়ে ধরল।

ছোঁড়াটার নাম রামধনী। বয়স বছর বারো তেরোর বেশি নয়। ছোটো ছোটো খোঁচা খোঁচা চুলগুলোর মাঝে মস্ত এক শিখা। এসে-ছিল শুধু একটা নেংটি পরে। রুক্ষ লম্বা লম্বা হাত পা। গালের ওপর রোঁয়া রোঁয়া কটা কটা লোম নেমে এসেছে জুলপীর জায়গাটা থেকে।

বিহারের দুর্ভিক্ষের সময় গাঁ ছেড়ে ভাসতে ভাসতে ছোঁড়াটা এসে ঠেকেছে এই শহরতলীর চটকল এলাকায়। পরদেশীয়ার ঘরে ঠাঁই পাওয়ার পর মাসখানেক ধরে রামধনী শুধু খেল গোগ্রাসে। কোনো দিকে তাকাত না, কোন কথা মাথায় ঢুকত কিনা কে জানে। গরাসে গরাসে শুধু যা পেত তাই খেত। খেতে খেতে নেংটির ওপর পেটটা ফুলে উঠত টান টান হয়ে, ঢোলের মত।

পরদেশীয়া কপট বিলাপ করে বলত, 'বহিন্ কি বলব, কোথায় বেটার রোজগার আমি খাব, না বেটাই আমার সমস্ত হপ্তাটুকু খেয়ে বলছে, আরো দাও—'

বেশ বোঝা যেত পরদেশীয়া খুশীই হয়েছে!

কিছুদিনের মধ্যেই দেখা গেল ছোঁড়াটা পরদেশীয়ার হ্যাওটা হয়ে পড়েছে অস্বাভাবিক রকম। পরদেশীয়ার আচলের খুঁট ছাড়া যেন নড়তেই চায়না।

পরদেশীয়া ঠেলে ঠেলে পাঠাত—'পুরুষ মানুষ এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি কর। বোকা হয়ে থাকলে চলবে?'

কিন্তু বালক রামধনী এদিক-ওদিক খানিক নড়াচড়া করে আবার এসে বসত ঠিক দাওয়াটার ওপর। ঘোরাঘুরি করার চেয়ে খুঁটিতে বাঁধা ছাগলটার সঙ্গে খুনশুটি করতেই তার বেশি পছন্দ। বাইরে বেরুলে মোটর দেখলে, লরি দেখলে, সাহেব দেখলে ভয়ে পালিয়ে আসত রামধনী।

পরদেশীয়া ছেলে চেয়েছিল, কিন্তু এমনি ভীতু একটা জিনিস তার কাছে অসহ্য। আগে হলে এমনি একটা ভেড়ী উজবুক গ্রাম্য ছেলেকে হয়ত ছি ছি করে তাড়িয়ে দিত পরদেশীয়া। হয়ত কোন একদিন তার

ধৈর্যচ্যুতির মুহূর্তে চ্যালা কাঠ দিয়ে পিটি দিত নিষ্ঠুরের মত। কিন্তু এবার পরদেশীয়া শুধু নিজের মনেই আফশোস করত, 'হা ভগোয়ান, এ বেটাকে নিয়ে আমি কি করব।'

চটকল ছুটির পর ঘরে ফিরে রান্না করতে করতে মাঝে মাঝে চটে উঠত পরদেশীয়া, 'তুই মর্দানা আছিস না জেনানা আছিস?'

বালক রামধনী তার সরল গ্রাম্য চোখে বোকার মত ক্যাল ক্যাল করে তাকিয়ে থাকত, কিছু বলত না। হয়ত কিছু বুঝত না।

'কিসের তোর এত ভয়, কাকে ভয়?'

রামধনী একদিন ভয়ে ভয়ে বলেছিল—'এই শহর! এই শহরে সে থাকতে চায়না। এই প্রচণ্ড ছুর্বোধ্য জনস্রোত থেকে সে ফিরে যেতে চায় গ্রামে।'

'বুদ্ধু!' পরদেশীয়া মুখে ধিক্কার দেয় রামধনীকে। কিন্তু মনে মনে চমকে উঠে, 'সত্যি সত্যিই যদি এটাও পালায়?'

লোকে উপদেশ দেয়, 'গাঁয়ের ছেলে, তারপর ছুর্ভিক্ষ। তাই ছোঁড়াটা ভড়কে রয়েছে। কলে ভর্তি করে দে। আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে।'

পরদেশীয়া শিউরে উঠে, বলে 'তাই দেব বহিন। দেখি আমার কপাল…'তাই শেষ পর্যন্ত রামধনীকে ধরে রাখার জন্যে ওকে কলেই ভর্তি করে দিল পরদেশীয়া।

ফুকা নলীর কাজ। যারা জোয়ান হয়নি, যাদের বয়স হয়নি এ কাজ তাদের। এক শিফটের কাজ কিন্তু খাটুনীর হার কম নয়, যদিও মজুরি কম। তবু সেই কাজ জোটাতেই কম হাঙ্গামা পোয়াতে হল না।

মাগীকলের সর্দারকেই প্রথম ধরেছিল পরদেশীয়া। সে তো হেসে অস্থির—'কাম! বলে, ফির একদফে ছাঁটাই হবে তারই নোটিস লেখা হচ্ছে, আর নতুন কাম?'

তারপর অবশ্য সে উপায় বাতলে দিয়েছিল। কিছু পান খিলাও হয়ে যাবে। পরদেশীয়া তার পর পর শূন্য হয়ে যাওয়া সঞ্চয়ের ঝাঁপিটা

উপুড় করে গুণে দেখল কত আছে। তারপর পায়ের মলজোড়া, আর প্রথম যৌবনের তৈরি করা রূপোর বাজু একটা আঁচলে বেঁধে চলে গেল স্যাকরার কাছে। লেবার অফিসার আর সর্দারের কাছে সাড়ে তিন কুড়ি টাকা গুণে দিয়ে রামধনীর জন্যে একটা টিকিট করিয়ে নিয়ে ঘরে ফিরল।

রামধনীকে বললে—'কাল থেকে তুই আমার সঙ্গে কলে খাটতে যাবি।'

রামধনী বোকার মত মাথা ঝাঁকায়, 'হাঁ।'

তারপর হঠাৎ কাঙ্গালিনীর মত তৃষ্ণার্ত লাল চোখে তাকিয়ে থেকে পরদেশীয়া ফিস্‌ফিস্ করে জিগ্যেস করে—'আর তুই যাবি? দেখ আমার যা ছিল সব দিয়ে তোর নোকরি করালাম। আর যাবি তুই আমাকে ছেড়ে?'

অদূরে খাটালটায় গরুগুলো ঘুমুতে ঘুমুতে খচমচ শব্দ করে মাঝে মাঝে। বস্তিগুলো ছাড়িয়ে মোড়ের পানের দোকানটায় একটা পুরানো গ্রামোফোন রেকর্ডের চিঁ চিঁ করা শব্দ ভেসে আসে গুমোট হাওয়ায়। বস্তির পুরানো কাঠের খুটির মাঝখানে একটা কাঠপোকা কটর কটর করে কাঠ কুরে কুরে চলে।

রামধনী কি ভেবে বলে, 'না যাবনা।'

মৃদু গলায় পরদেশীয়া বকতে থাকে, 'না যাসনা। আমি বুড়ো হয়েছি। আর কতদিন কলে খাটব? তুই কলে ঢুকলি, এবার জোয়ান হবি, মরদ হবি, তোর সাদী দিব। বহুর হাতের রান্না খাব আমি। না যাসনা বেটা রামধনী....'

বোধহয় জীবনে এই প্রথম নিজেকে সুখী মনে হল পরদেশীয়ার।

বাঁশী বাজার আগেই সে ঠেলে তোলে রামধনীকে। তাকে খাইয়ে দাইয়ে তৈরি করে সঙ্গে করে নিয়ে যায় কলে। তারপরেই অবশ্য ওদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যেতে হয়। পরদেশীয়া চলে যায় তার মাগী কলে। যাবার সময় বার বার পেছন ফিরে ফিরে উপদেশ দিতে দিতে যায়—'ধরমসে কাম করিস, ওপরওয়ালার কথা শুনিস। অন্যের

দেখাদেখি সাহস করে চলন্ত মেসিনের পাশে হাত দিয়ে যেন ফুকানলী কুড়াতে যাসনা।' এমনি নানা উপদেশ। শিফট শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে পরদেশীয়া আর দাঁড়ায় না। স্পীনিং ঘর, ববিন ঘর, ব্যাচিং ঘরের হঠাৎ নিস্তব্ধ মেসিনগুলো উজিয়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি গিয়ে দাঁড়ায় তাঁত-ঘরের মেঝেটার ওপর। এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে হাঁকে—'রামধনী!'

রামধনী প্রথম প্রথম অসহায়ের মত অপেক্ষা করত এই ডাকটার জন্যে। পরদেশীয়ার গা ঘেঁসে এসে দাঁড়াত। গা মাথা থেকে সাদা সাদা চটের ফেঁসোগুলো ঝাড়তে ঝাড়তে গেট দিয়ে হুড় হুড় করে বেরত মজুরেরা। যেন একটা আবদ্ধ ধূসর উচ্ছ্বাস হঠাৎ ছাড়া পেয়েছে। ভিড়ের মধ্যে যাতে না হারিয়ে যায়, পরদেশীয়া যাতে চোখের আড়াল না হতে পারে, তার জন্যে বার বার করে তাকিয়ে দেখত রামধনী।

তারপর সত্যি সত্যিই কোন এক সময় গ্রাম্য আনাড়ী জড়তা কেটে গিয়েছিল রামধনীর, কেউ খেয়াল করেনি। কেমন করে যেন চলন্ত মেসিনের পাশে গুঁড়ি মেরে ক্ষিপ্র হাতে ফুকানলীগুলো কুড়িয়ে নিতে সে দক্ষ হয়ে উঠল, কেমন করে যে সে ফুকানলীর কাজ থেকে ধীরে ধীরে স্পীনিং এর কাজে পদোন্নতি পেয়ে চলে গেল, কেমন করে যে এই ইঁট পাথর সিমেণ্ট আর যন্ত্রে ভরা এই শহরতলীটার সঙ্গে সে মিশে গেল, তা খোঁজ রাখার প্রয়োজন বোধ করেনি কেউ।

পরদেশীয়া বোধ হয় এমন সুখী আর কখনো বোধ করেনি।

কিন্তু হঠাৎ একদিন রামধনীর মুখের দিকে তাকিয়ে ভেতরে ভেতরে কেমন যেন চমকে উঠল পরদেশীয়া—'রামধনী বেটা, কি হয়েছে তোর?'

রামধনী অবাক হয়ে বললে—'কি হয়েছে মা? কিছুই তো না!' পরদেশীয়া কোন উত্তর দিলেনা। আপন মনে বিড় বিড় করতে লাগল, 'না হয়েছে, আমার চোখকে ফাঁকি দিবি?'

পড়শীদের কাছে পরদেশীয়া চুপি চুপি গিয়ে বলে—'রামধনীকে দেখেছ তোমরা। ওর চোখ দুটো দেখেছ? এবার ও বিগড়াবে। আমার আর আর বেটাগুলোরও এমনি হয়েছিল। আমি জানি…'

কিন্তু কি হয়েছে রামধনীর তা আর কারো চোখে পড়ে না, শুধু পরদেশীয়ার চোখ, মায়ের চোখ ছাড়া। সবাই রামধনীর বালক সুলভ অথচ ডগডগে হয়ে বেড়ে ওঠা দেহের দিকে চায়, লক্ষ করে তার লম্বা লম্বা হাতপায়ের হাড় ঢেকে মাংসপেশীর সৌন্দর্য জাগছে, সরল কিশোর ঠোঁটের ওপর পাঁশুটে রোঁয়াগুলো কালো হয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। তারা অবাক হয়ে বলে, 'কি বলছ পরদেশীয়া ?'

'না, না তোমরা জানোনা; আমি জানি—'বলে পরদেশীয়া অপেক্ষা করে। কিছু একটা আসবে—কিছু একটা ঘটবে এটা যেন সে আগেই বুঝতে পেরেছে।

তারপর শিফট্ থেকে ফিরে রামধনী একদিন একটা কুর্তার পকেট থেকে হিন্দী উর্দ্দু ছাপমারা একটা কাগজ পরদেশীয়ার হাতে দিয়ে বললে—'মায়ী য়ুনিয়নের মেম্বর হয়ে গেলাম ··রসিদটা ভালো করে রেখে দে···'

পরদেশীয়া চমকে উঠল। তাহলে সত্যি সত্যিই তার আশঙ্কা ঠিক। রামধনীর চোখের সর্বনাশা ছটাটা তাহলে এই। কিছুদিন যাবৎ চটকলের মধ্যে একটা চাপা উৎসাহিত গুজব চল্‌ছিল, শুনেছ লালঝাণ্ডারা নাকি আবার এসে গেছে। তাহলে তারই সর্বনাশা মোহে পড়েছে রামধনী !

রামধনী খেয়াল করে না। অন্য কি একটা কথা ভাবে। অন্য কোন একদিকে চেয়ে থাকে। তারপর হঠাৎ আপন মনে রুটি ছিঁড়তে ছিঁড়তে বলে, 'জানিস মায়ী, কলের লোকেরা বলছে, আবার যখন লালঝাণ্ডা এসে গেছে তখন নাকি রাজু মিস্ত্রিও কোথা থেকে ঠিক এসে যাবে···'

কলের লোকেরা সকলেই জানে রাজু মিস্ত্রির নাম। নাম নয় যেন মন্ত্র। সর্বনাশা এক মন্ত্র। কেউ দেখেছে, কেউ দেখেনি, কিন্তু সকলেই তার নাম জানে। কেউ নতুন কাজে ঢোকে, কেউ ছাঁটাই হয়। পাঁচ বছর আগে মজুররা যা ছিল, পাঁচ বছর পরে আর তা থাকেনা। অদল বদল হয়ে যায়। কিন্তু রাজু মিস্ত্রির নাম থাকে অব্যাহত। অনেকদিন

আগে কোনো এক সময়ে হঠাৎ নাকি রাজু মিস্ত্রি তাঁতঘরের সাহেবদের মুখের ওপর হেঁকে উঠেছিল 'তাঁতী ভাইলোগ সব বাহার আ যাইয়ে। হরতাল!' আর সঙ্গে সঙ্গে ছুই মিলের দশ হাজার মজুর ছড় ছড় করে বেরিয়ে এসেছিল বন্যার মত। বন্যার মত চিৎকার করতে করতে ছু পাশের অন্যান্য মিলগুলোতে গিয়ে হাজির হয়েছিল। শুরু হয়ে গিয়েছিল সাধারণ ধর্মঘট। ইট সিমেন্টযন্ত্রের এই শহরতলী এক মুহূর্তে যেন মাথা নিচু করে মেনে নিয়েছিল মজুরের হুকুম।

তারপর ছাঁটাই হয় রাজুমিস্ত্রি। কেউ বলে তার জেল হয়ে গেছে। কেউ বলে তার জিলা খারিজ হয়ে গেছে। কেউ বলে, সে মরে গেছে, কংগ্রেসী সরকার জেলের মধ্যে যে গুলি চালায় সে তো রাজুমিস্ত্রিকেই মারবার জন্যে। কেউ বলে, না ও মরেনি। ও আবার ঠিক এসে যাবে দেখো, রামধনী রুটি ছিঁড়তে ছিঁড়তে আপন মনে বলে চলে।—'জানো মায়ী, মরদ হতে হলে চাই অমনি মরদ।' তারপর নিজের মনেই খিল খিল করে হাসে—'আমি প্রথম প্রথম কী ভয় পেতাম!'

হঠাৎ বিকৃত গলায় চিৎকার করে ওঠে পরদেশীয়া—'ঝুট্ বাত, রামধনী ঝুট বাত। রাজু মিস্ত্রি মরে গেছে, ও আর ফিরবে না। তোরা শুধু শুধু আবার ছাঁটাই হবি, খামকা আবার সর্বনাশ করবি রামধনী। আবার গোলমাল বাধাবি কিন্তু কিছুই করতে পারবি না। আমি জানি রামধনী, আমি ছু' কুড়ি বছর চটকলে আছি, আমি জানি। কথা শোন, আমাকে ছেড়ে যাসনা, কথার খেলাপ করিস না রামধনী'

রামধনী বিস্মিত হয়ে তাকায় পরদেশীয়ার আতঙ্কিত ধূসর চোখ-জোড়ার দিকে। তারপর যেন এক অনাত্মীয় অপরিচিত মানুষের মত বলে—'নেহি মায়ী, তুমি জানো না....'

জানে না? খুব জানে পরদেশীয়া, ছু' কুড়ি বছর ধরে ও দেখে আসছে এই সর্বনাশা মন্ত্রের জোর। অপেক্ষা করে, অপেক্ষা করে, তারপর হঠাৎ একটা কি যেন বিশ্বাস করে বসে সবাই, হাজার হাজার মজুর পাঞ্জা ধরে কলকাতার সঙ্গে, সাহেব পুলিশের সঙ্গে, মালিকের সঙ্গে। তারপর আবার ছাঁটাই আক্রমণ। আবার মাথা নিচু করে অপেক্ষা।

এই স্রোতে পা দিলে রামধনী ফিরবেনা। ফিরতে পারেনা।

উন্মাদের মত তার এই শেষ ব্যাটাটাকে ধরে রাখতে চায় পরদেশীয়া। নিষ্ঠুর কর্কশ গলায় গালাগালি দিতে থাকে রামধনীকে 'ছিঃ ছিঃ খাওয়ালাম পরালাম বড়ো করলাম, এখন নিমকহারামী না করলে তার চলবে কেন ?'

রামধনী অবাক হয়ে তাকায়—কিছু বলেনা।

তারপর সত্যি সত্যি যা আশঙ্কা করা যাচ্ছিল তাই হল।

কিছুদিন ধরেই বোঝা যাচ্ছিল ওপরকার মহল প্রস্তুত হচ্ছে। সর্দাররা অকারণে ঘরে ঘরে টহল দিতে শুরু করল বেশি করে। সাঁরি সারি চলমান তাঁতগুলোর একঘেয়ে ঘর্ঘর শব্দের ওপর কণ্ঠস্বর তুলে কর্কশ গলায় চিৎকার করে করে গেল—

'কমিউনিস্ট লোগোঁকা চর কই ঘুসা হোগা জরুর।'

'সবকইকো হুসিয়ার কর দিয়া যাতা হায় কি ইসকা নতিজা খারাপ হোগা বহুৎ....'

মিলের ছোট সাহেব লেবার অফিসারের সঙ্গে কয়েকবার ঘোরাঘুরি করে গেল ডিপার্টে ডিপার্টে।

তারপর হঠাৎ একদিন ডিপার্টে থেকে ডিপার্টে, এক কোণ থেকে আর এক কোণে খবরটা পৌঁছে গেল—পুলিস! মিলিটারী! পুলিস এসেছে মিলের ভেতর!

এক মুহূর্তে কেমন যেন স্তব্ধ হয়ে যায় সমস্ত কারখানাটা। আপন আপন মেসিনের উপর ঝুঁকে পড়ে সবাই। নিঃশব্দে হাতে কাজ করে যায় কিন্তু কানটা উদগ্র হয়ে থাকে ঘটনার জন্যে।

'কতো পুলিস ?'

'বহুৎ! শ দোশ' হোগী জরুর।'

'কেয়া মতলব ?'

'আউর কেয়া!'

বিস্তীর্ণ রাক্ষুসে মিলটার এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত শুধু যন্ত্র আর কাজের একঘেয়ে শব্দটা বেজে চলে ঝক ঝক করে। তার

মধ্যেই ঠাহর হয় মেঝের ওপর নালপরা পুলিসী বুট জুতোর কর্কশ আওয়াজ। লেবার অফিসারের খনখনে গলায় ইংরেজী শব্দের দু' একটা রেশ। মাগীকলের মাদ্রাজী মেয়ে মজুরের স্তন্যপোষ্য একটা বাচ্চা এতক্ষণ মেঝের এক কোণে ঘুমাচ্ছিল। কেন জানি সেটা জেগে উঠে চিৎকার করতে থাকে ট্যাঁ ট্যাঁ করে।

ছাঁটাই! এগার আদমী ছাঁটাই!

খবরটা পৌঁছে যায় সর্বত্র। পুলিসের সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটা সর্দার আগুবাড় হয়ে হুমকি দিয়ে বেড়াচ্ছে—'বদমাসী মাত করনা বাবা! ইস্‌কা নতিজা আভি দেখ লেও।'

পরদেশীয়া জানত এমনি হবে, এমনি হয়। অনেকদিন পরে মিলের ভেতর যেই মজুরেরা আবার মাথা তুলতে থাকে, পুরানো ছাঁটাই মুখিয়া লোকদের জায়গা নিয়ে যেই আবার নতুন একদল মুখিয়া লোক গড়ে উঠতে চায় অমনি আসে আক্রমণ। অন্যমনস্কভাবে পরদেশীয়া তার কাজ ফেলে পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় কারখানার চত্বরটার দিকে, যেখানে পুলিস পাহারায় এগারো জন ছাঁটাই মজুরকে জড়ো করা হচ্ছে।

রামধনী আছে ঐ এগারো জনের মধ্যে। পুলিসগুলো বন্দুকের পেছন দিয়ে খোঁচা মারছে ওদের। যত তাড়াতাড়ি কারখানার বাইরে বার করে দিতে পারে ততই মালিকদের স্থবিধা। বার করে দেবার সময় মজুরেরা যাতে কোন রকম হাঙ্গামা বাধাতে না পারে তার জন্যেই এত পুলিস।

ছাঁটাই মজুরগুলো যাচ্ছেনা, যেতে চাচ্ছেনা, দূর থেকেই দেখা যাচ্ছে বন্দুকের গুঁতো খাওয়া সত্ত্বেও ফিরে ফিরে দাঁড়াচ্ছে, ভাঙ্গা গলায় চিৎকার করে কি যেন বলার চেষ্টা করছে। হয়ত আশা করছে মজুরেরা এবার রুখে দাঁড়াবে, হয়ত হরতাল করে বেরিয়ে আসবে হাজার হাজার মেহনতী মানুষের এক জনস্রোত।

অসহ্য মুহূর্ত কয়েকটা। কি হবে! কি হবে! আপন আপন মেসিনের ওপর ঝুকে পড়েও কান খাড়া করে আছে সবাই। কি হবে?

কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই হলনা। ঝট করে কেউ কিছু করতে চাইল না। এবারও কিছু হলনা। শুধু কারখানার সমস্ত আবহাওয়াটা আরো গুমোট, আরো টান টান হয়ে উঠল কেমন।

সমস্ত কিছু ভুলে পরদেশীয়া উৎসুক হয়ে তাকিয়ে ছিল রামধনীর মুখের দিকে। মুহুর্মুহু বন্দুকের কুঁদোর গুঁতো সত্ত্বেও রামধনী বার বার তার তাজা অবাধ্য ঘাড়টা ফিরিয়ে কি বলছে মজুরদের দিকে। কারখানার খোলা চত্বরের এক ঝলক রোদ এসে পড়েছে তার ঘর্মাক্ত কিশোর মুখটার ওপর। বন্দুকের গুতোয় মাথায় খানিকটা সম্ভবত কেটে গিয়ে একটা রক্তের ক্ষীণধারা বুঝি নামছে কপাল বেয়ে।

হঠাৎ চমকে ওঠে পরদেশীয়া। মরদ। সত্যি সত্যিই কোন সময় যেন জোয়ান মরদ হয়ে গেছে ওই চৌদ্দ বছরের ছেলেটা।

তারপর অভ্যাসবশে আপন মনে চিন্তিত গলায় গাল দিতে শুরু করে রামধনীকে। 'নিমকহারাম, কোন আবাগীর বেটী পেঠে ধরেছিলো তোকে। বুড়ী মায়ীকে কথা দিয়ে কথা বাখিসনা···বুড়ী মাকে এত তুখ্ দিলি তুই '

অন্য অন্য বার যেমন হয়েছিল তেমনি নিষ্ঠুর, তেমনি হিংস্র গলায় গাল দিতে চায় পরদেশীয়া। কিন্তু বুঝতে পারেনা কোন সময় যেন তার পুরুষালী গলাটা বুজে বুজে এসেছে, তার ঘোলা তু' চোখ বেয়ে জল পড়ছে ঝর ঝর করে। শিফট ছুটির পর পরদেশীয়া তাড়াতাড়ি ঘরে ফেরে। না, রামধনী ফেরেনি। একদিন তুইদিন, তিনদিন তবু ফিরল না রামধনী।

কেউ বললে, জেলে নিয়ে গেছে।

কেউ বললে, না জেলে নেবে কেন. থানায় নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিয়েছিল। পথে আসার সময় মালিকের গুণ্ডারা খুন করে ফেলে দিয়ে গেছে গঙ্গার কাছের ড্রেনটায়। লাশটিও নাকি কে দেখেছে।

কেউ বললে, হয়ত লুকিয়ে আছে কোথাও, আবার আসবে।

কিন্তু এক মাস তুই মাস গেল, না এল রামধনী নিজে, না পাওয়া গেল তার খবর। ওদিকে মিলের ভেতর ধর্মঘট হলনা বটে. কিন্তু

নিঃশব্দে একহাত থেকে আর এক হাত ঘুরে বেড়ায় ইউনিয়নের রসিদ বই। লোকে চুপি চুপি নেয়। বলে—

'হাঁ সাচ্চা! ওহি লাল ঝাণ্ডাকা…'

পরদেশীয়া সুযোগ পেলেই ডিপার্টে ডিপার্টে বলে বেড়ায়—'ঝুট বাত্। তোমরা কিছু জাননা। আমি দুই কুড়ি বছর চটকলে কাজ করছি—আমি জানিনা? শোন আমার কাছে'—বলে ফিস ফিস করে জানায়, 'রামধনী ফির্ আ যায়গা, সমঝো? ডরো মত। আমার বেটা তো লড়কা নেই। মরদ হই গেছে। ও আসবে। আর রাজুমিস্ত্রীও আসবে। টাইম হলে সবাই এসে যাবে। আমি জানি না?'

চিত্রাদিন

মনে মনে একটু বিশ্রামের জন্যে কাঙাল হয়ে উঠেছিল লতা।

কোনো কিছু নতুন করে শুরু নয়, কোনো কিছু থেকে পলায়নও নয়। শুধু একটু বিরতি। একটা যুগ তো কাটল, প্রায় গোটা একটা যৌবন। একটা ইতিহাস যেন সম্পূর্ণ হয়ে গেছে তার। স্বপ্ন, ভাবাদর্শ, মেহনত, বিপদ, আত্মগোপন আর তারই মধ্যে সংক্ষিপ্ত, কয়েকটা মুহূর্ত, —বিয়ে; তারপর দীর্ঘ জেলখানা; জেলখানা থেকেই সংবাদ এল আর একটা জেলে গুলিতে মারা গেছে—প্রশান্ত।

জেল থেকে ছাড়া পেয়ে তাকে সোজা চলে আসতে হয়েছে হিন্দুস্থানে। আর কোনো হিসাব নয়, কোনো উত্তেজনা নয়, সমাজ, জীবন, রাজনীতির অনেক যা কিছু সে এখনো বোঝেনি, অনেক যা কিছু না বুঝেই কেমন একটা ঘোরের মধ্যে যৌবনের বছর কটা খুইয়ে এল তা বোঝার জন্যে আরো একবার কোমর বাঁধা নয়—শুধু একটু পা গুটিয়ে বসা, ক্লান্তিকর একটানা নিঝুম মেহনতের পর শুধু একটু চোখ বুজে পড়ে থাকা। একটু নিরালা।

সেইজন্যে ঘুরে-ফিরে আবার ওই সেই কমিটি আর সংগঠনের দ্বারস্থ হবার ইচ্ছে তার মোটেই ছিল না। তবু আশ্রয়ের কথা ভাবতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত সেই ওদের কথাই ভাবতে হল তাকে। একে উদ্বাস্তু তায় অবাঞ্ছিত রাজনীতির ছাপ, তার ওপর মেয়ে। দূর-সম্পর্কিত দু-চারজন আত্মীয়-স্বজনের কাছে চিঠি দিয়েও যখন জবাব এল না তখন লিখতে হল ওই বন্দীমুক্তি কমিটির কাছেই।

সেই উপলক্ষে কল্যাণ এসেছিল শিয়ালদায়।

তার জেলারই মেয়ে লতা! তবু বছর তেত্রিশ-চৌত্রিশের এই বয়স্কা ময়লা চেহারার নিষ্প্রভ মেয়েটিই যে সেই সে-দিনের কলেজ যাওয়া ছাত্রী তা স্থির করতে বেগ পেতে হয়েছিল বৈ-কি। একটু এগিয়ে এসে কল্যাণ হেসেছিল, 'আপনাকে চেনা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কই আপনার জিনিস-পত্র কি আছে?'

লতা তার নিষ্প্রভ বয়স্ক চোখ দুটো তুললে অপরিচিতের মতো। তারপর সেও হেসেছিল, চেনা লোককে অনেকদিন পরে চিনতে পারলে লোকে যেমন করে হাসে. 'ও আপনি? আপনি তো কল্যাণবাবু না?'

তারপর বিব্রতের মতো থামতে হয়েছিল লতাকে। কল্যাণবাবু? না কল্যাণদা? না-কি শুধু কল্যাণ? কি বলে ডাকত সে? মনে নেই একটুও। কি আশ্চর্য, কেন মনে নেই তার? অথচ সত্যিই মনে করতে পারল না লতা। অনেকদিন আগে, প্রথম যখন সে কলেজের ছাত্রী হিসেবে রাজনীতিতে এসেছিল, তখন এই লোকটাই ছিল তাদের অন্যতম এক নেতা। তারপর ওরা ওখানেই থেকে গিয়েছিল। কল্যাণ চলে এসেছিল কলকাতায়, তারপর আজ এ তো শুধু এক দেশ পেরিয়ে আর একটা দেশে আসা নয়, একটা কাল পেরিয়ে অন্য একটা কালে এসে দাঁড়ানো। কিন্তু সত্যিই কি কোনোদিন কল্যাণকে কখনো ও ডেকেছিল সে সময়? কতোটুকুই বা আলাপ? হয়তো দেখেছে, বৈঠকে বসেছে একসঙ্গে কিন্তু কখনো সম্বোধন করারই প্রয়োজন পড়েনি হয়তো?

'কি ভাবছেন? কই আপনার জিনিসপত্র কই?'

লতা তাড়াতাড়ি তার ছোটো পেটমোটা একটা সুটকেশ দেখাল, সতরঞ্চি দিয়ে জড়ানো হাস্যকর একটু বেডিং। 'কিন্তু আপনি? আপনাকে চেনাও মুশকিল বৈকি। কি রকম যেন'—

লতা শেষ করতে পারে না, শেষ করে কল্যাণ নিজেই—'কি রকম বুড়ো বুড়ো তাই না?'

বলে অনায়াসে হো হো করে হাসে, 'কিন্তু আমি যে, আপনার চেয়েও বয়সে বড়ো। ফাল্গুন কি আর চিরকাল থাকে? হয়তো চৈত্রও যেতে বসেছে…'

লতা হাসে না। শুধু উদাসীন চোখে একটুখানি তাকিয়ে দেখে কল্যাণের কানের ওপরে রগের কাছে কঁ্যাটকেঁটে কুৎসিত কয়েকটা পাকা চুলের আঁচড়। মুখের ভাঁজে বয়সের কতকগুলো ছাপ। আর সে হাসি শুনে কোথায় যেন একটু জ্বালা করে ওঠে লতার। বয়স হয়েছে কিন্তু তাতে অমন লোক দেখানি হাসি হেসে কি বোঝাতে চায় লোকটা? কি প্রমাণ করতে চায়?

'চলুন।' কল্যাণ মালপত্তরগুলো দখল করে হাঁটতে শুরু করেছিল। কিছুদূর এগিয়ে স্টেশনের সিঁড়িতে একটু দাঁড়াল, 'কিন্তু যাবেন কোথায়?' যেন সে কথাটাও লতাকেই ঠিক করতে হবে।

লতা আচ্ছন্নের মতো তাকিয়ে দেখছিল কলকাতাকে। আগে কলকাতা সে না এসেছে এমন নয়। কিন্তু এবার এল সেই একযুগ পরে। স্টেশনের চত্বর থেকে দেখা যায় ত্রস্ত ট্রাম, বাস, ভিড়, অপরিচিত, অকরুণ নির্বিকার একটা স্রোত। বড়ো যান্ত্রিক, বড়ো স্পষ্ট, বড়ো দগ্ধ, দীপ্ত। হঠাৎ ভারি দুর্বল লাগে লতার, বড়ো একলা।

'কোথায় যাবেন?'

লতা চমকে ওঠে, 'কি, আমাকে বলছেন? যাবো? আমার এক দূর সম্পর্কের দাদা আছেন। তাঁদেরও লিখেছিলাম। কিন্তু কই কেউ তো এল না।' তারপর যেটা সে চায়নি, সেইটার কথাই জিজ্ঞেস করতে হল। 'কিন্তু আপনাদেরও কি কোনো জায়গা ঠিক নেই?'

কল্যাণ ভুরু কুঁচকে কি ভাবলে, 'আমার একটা ডেরা আছে অবশ্য। আমার মতো বাউণ্ডুলে আরো অনেকে থাকে। সেখানে আপনাকে তোলা একটু মুশকিল—মেয়েদের থাকার মতো কোনো ব্যবস্থা নেই তো। তাই ভাবছি….'

'কেন কমিটি থেকে কিছু ঠিক করেনি?'

আবার হাসল কল্যাণ। আর হঠাৎ মনে পড়ে লতার, এমনিভাবে সে আগেও হাসত। সমস্যাগুলো যখন এত গুরুতর হয়নি তখন কোনো একটা গুরু সমস্যার সামনে এমনি করে একটা লোক হাসতে পারে দেখে সেদিন লতা অবাক হয়েছিল, আজ শুধু গা জ্বালা করে তার। একটু বিব্রতভাবেই সে বলে, 'হাসছেন কেন ?'

'কারণ, কমিটি মানে তো আসলে আমার মতোই দু-চারজন। সেটা যতোটা চলবে বলে ভেবে রেখেছেন, নানা কারণে ততো চলছে না। ফলে আপাতত আমার ব্যক্তিগত সামর্থ্যই ভরসা। তাই বলছিলাম—'

লতা ইতিমধ্যে অন্য কি একটা ভেবে সচকিত হয়ে ওঠে, 'যা, বিশু কোথায় গেল, বিশু ?'

'সে কে ?'

'আমার সঙ্গে এসেছে একটা ছেলে ; হিন্দুস্থানে কেউ নেই, আমাকে ধরেছিল, নিয়ে চলুন লতাদি। ভাবলাম থাক ও সঙ্গে, যদি কিছু করতে পারে। কিন্তু কোথায় গেল আবার ?'

পাকিস্তানি নোটের বদল যারা দেয় তাদের ভিড় থেকে বিশু সঙ্কোচের সঙ্গে এসে দাঁড়াল লতার পেছনে। হাতে তার একটা চটের থলি, বগলে পুঁটলি। থলিটায় শুধু কিছু ছাড়ানো নারকেলে ভরতি। বোঝা যায় সঙ্কোচের জন্যই ছেলেটা এতক্ষণ কল্যাণের সামনে আসেনি।

লতা ওকে দেখে শান্ত হল একটু, 'একেও আবার নিয়ে এলাম। আপনাদের এইরকম অব্যবস্থা তা জানলে···'

কল্যাণ কি ভাবলে কিছুক্ষণ। তারপর লতাকে এড়িয়ে অকারণে উৎসাহ দিতে লাগল বিশুকে 'হিন্দুস্থানে এসেছ ভাই ? কিন্তু সাবধান, খুব সুবিধে হয়ে যাবে সেসব কিছু ভেবো না। দেখছ তো কি রকম ভিড়। কতো টাকা আছে ? নেই ? বাস্ বাস্। বেশ চলো আমাদের ডেরায়। দশদিন বিনা পয়সায় খাওয়াবো। তারপর কিন্তু নিজেকেই কিছু রোজগার করতে হবে। পারবেনা ? অল্প বয়স ভাবনা কি ? দাঁত কামড়ে লেগে থাকলে কিছু একটা করা যাবেই, না ?'

'তাহলে কি ঠিক করলেন ?'

নির্লজ্জের মতো কল্যাণ হাসল আবার, 'আপনার ভাইয়ের ঠিকানাটা দিন, সেখানে আপাতত আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি। পরে দেখা যাবে···কি বলেন ?'

দূর সম্পর্কের যে ভাই চিঠি পেয়েও স্টেশনে এল না তারই বাড়িতে ওঠা। লতার একটু অস্বস্তি লেগেছিল প্রথমটা, কিন্তু খানিক বাদেই হাঁপ ছেড়ে তার মনে হল, ভাগ্যিস ওদের কবলে গিয়ে পড়তে হল না। এই-ই ভালো। একটু দূরে থাকতে চায় সে। রাজনীতির যে জগতটার জন্যে একটা যৌবন সে প্রায় খরচ করে এল আপাতত তা থেকে একটু দূরে, একটু নিরালায়।

দেখা গেল, লোককে প্রভাবিত করার ক্ষমতা আছে কল্যাণের রীতিমতোই। এ ক্ষমতার যাদুটা কিন্তু লতাকে আর বিস্মিত করে না। বরং বিরক্ত করে তোলে। বেশ বোঝা গিয়েছিল ছা পোষা কেরানী ভদ্রলোকটি তার এই দূর সম্পর্কের বয়স্কা বিধবা, রাজনীতির বাঘে-ছোঁয়া বোনটিকে সংসারে ঠাঁই দিতে খুব উৎসুক ছিলেন না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রায় অঙ্কের মতো নির্ভুলতায় অভিভূত হল লোকটা। কল্যাণ চলে আসার সময় অকৃত্রিম গলাতেই সে জানিয়েছিল, 'এই তো একখানা ঘর। কাচ্চা বাচ্চা নিয়ে থাকা। আমি না হয় বারান্দায় শোবো। অসুবিধা ওঁরই তো হবে···তবু আমার যা সাধ্য····'

যাবার সময় কল্যাণ গুণে গুণে কয়েকটা নোট দিল লতার হাতে।

'আপাতত এইটে রাখুন। আর যদি লাগে পরে চেষ্টা করব···'

'চেষ্টা মানে তো আপনার একার চেষ্টা ?'

আবার নির্বিকার নৈর্ব্যক্তিক হাসি হাসল কল্যাণ, 'ও সেই কমিটির কথা বুঝি মন থেকে যাচ্ছে না আপনার ? দেখা যাক ওটাকে দাঁড় করানো যায় কিনা। ইতিমধ্যে, হাঁ আমারই এবং আমার মতো দু-চারজনের চেষ্টা। আমাদের জেলায় অনেকে তো এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে আছে। সকলে রাজনীতিতেও ঠিক নেই। সাহায্য চাইলে এখনো কিছু পাওয়া যায় বই কি।···চলো হে বিশু এবার তোমার

স্বপ্নের হিন্দুস্থানটা ভালো করে দেখে নাও। তবে টিঁকে থাকতে হবে, পেছিয়ে গেলে চলবে না। তাই না ?'

আর এই শেষের কথাগুলোয় আবার কেমন জ্বালা জ্বালা করে উঠেছিল লতার মন। সেই এক সুর। দীর্ঘ একটা যৌবন সে এই সুরের কথাই শুনে এসেছে। বহুবার। সে নিজেও অনেককে বলেছে, প্রায় মুখস্তের মতো—প্রায় একটা অভ্যাসের মতো, অস্বস্তিকর একটা উপদেশের মতো। পাকিস্তানের গোপন দিনগুলোতে শুনেছে, জেলে শুনেছে, এখানেও শুনছে। যারা বলেছে তারা নানা নামের নানা মানুষ। নানা কমিটি নানা এলাকার লোক—কিন্তু হঠাৎ মনে হয় তারা বড় এক। যেন একটা এক মাপের নিরুত্তাপ হরফে তারা সবাই মুখস্ত করা একটা নির্বিকার লাইন। উৎসাহ দেবার জন্য ঐ ইচ্ছাকৃত অন্তরঙ্গতা, অস্বস্তি ভোলাবার জন্য ঐ জোর করে অভ্যাস করা হাসি, বিষণ্ণতাকে প্রশ্রয় না দেবার জন্য ঐ সন্তর্পণ লঘু পরিহাসের সুরে ওরা সকলে কি একান্তরূপ এক।

এই কথাটাই লতা পরের বার একটু তিক্ত ভাবেই বলেছিল কল্যাণের মুখের ওপর। হয়তো বলত না কিন্তু অকারণে ওকে আবার সেই অনায়াস নৈর্ব্যক্তিক হাসি হাসতে দেখে লতা আর পারেনি।

কল্যাণ একটু বুঝি আহত হয়েছিল। বললে, 'সেই একই কথা বলতে হচ্ছে বলে রাগ করছেন ? কিন্তু কি করি বলুন, যা বড়ো কথা যা সত্যি কথা তার চেহারাই যে বড়ো এক। সত্য কথা তো আর মিনিটে মিনিটে পালটে যায় না।'

'কিন্তু তা কি আপনি আবিষ্কার করেছেন, নাকি অন্যের আবিষ্কার মুখস্ত করেছেন।'

'হয়তো বুদ্ধি দিয়েই কথাটা আগে ধরতে হয়েছে, অনুভব দিয়ে তা পরে আবিষ্কার করা যাবে। তাতে অন্যায় আছে কিছু ?'

লতা চুপ করে গিয়েছিল। কিন্তু এই অস্বস্তিকর চুপ করে যাওয়াটাকে পরমুহূর্তে লঘু প্রসঙ্গান্তরে নরম করে এনেছিল কল্যাণ, 'যাই

বলুন আপনাদের ঘরখানা বেশ। শোনো, শোনো তো খোকা—কি পড়ো তুমি? ক্লাস কোর? বেশ?'

কথা ছিল, ভাইয়ের বাড়িতে থাকলেও লতার ভরণ-পোষণের আংশিক দায়িত্ব কমিটির অর্থাৎ আসলে কল্যাণের। সেই হিসেবে সে কিছু কিছু সাহায্যের টাকা পৌঁছে দিত লতাকে। কিন্তু সেবার দিতে গিয়ে সে একটু থামল—'যদি খুব দরকার থাকে তাহলে রাখুন। নইলে…'

'নইলে কি?'

'মানে একটু মুশকিল হয়েছে। পূর্ববঙ্গ থেকে আর একটা ছেলে এসেছে, কিন্তু বেচারির টি-বি। কোথাও জায়গা হয়নি। শিয়ালদহ স্টেশনেই পড়ে আছে আজ কয়েকদিন। ওর জন্যে—'

'সেটাও আপনাকেই দিতে হবে? আর এমনি গোজামিল দিয়ে?

'মানে, ছেলেটাকে যদি না দেখতাম, তাহলে হতো। কিন্তু চেনা ছেলে তো। দেখতে গিয়ে মুশকিল। কিছু না করলে তো এখন ওখানেই মরবে—'

'একলা কতটা করবেন?'

'যতটা পারি। তাছাড়া একলা তো আর সত্যি নই। যে মজুর ইউনিয়নটার কাজ করি তারা কিছু চাঁদা দেবে বলেছে। জেলার পুরনো লোকজনেরাও আছে, তারা কি আর ফেরাবে?—ও বলতে ভুলে গেছি, আপনার বিশু একটা কাজে লেগেছে। কাগজ-গুদামে কাগজ বাছাই—বারো আনা করে রোজ; খাওয়াটা চলবে।'

লতা নোট কটা ফিরিয়ে দিয়েছিল, 'না আমার লাগবে না।'

'অসুবিধা হবে না তো?'

'না।'

কল্যাণ সত্যিকারের খুশিতে নাকি কে জানে, হেসেছিল, 'আপনি বাঁচালেন।…' তারপর অনায়াসে দাবি করেছিল—'ভাবছিলাম, আপনি তো বি-এ পাশ করেছিলেন না! দেখুন না, নিজের পায়ে একটু নিজে দাঁড়াতে পারেন কিনা—।'

'তাই দেখব।'

কিন্তু মুখে না বললেও, কল্যাণ চলে যাবার পর ক্রমেই বিরক্ত হয়ে উঠতে থাকে লতার মনটা। অসুবিধা হবে না আবার, খুব হবে। কল্যাণও জানে সে-কথা। জেনেও শুধু ভদ্রতা করে জিজ্ঞেস করেছে। টাকার যদি এতই টানাটানি তাহলে ওটা দেখাবার জন্যে আনাইবা কেন? লতা জানে এ-শুধু সেই মুখস্ত করা আচরণ, পরিকল্পিত ভদ্রতা। এমনি করেই রাজনীতি তাকে প্রথম আকর্ষণ করেছিল। আজো তার কাছে পর্যন্ত সেই একই পদ্ধতির আশ্রয় নিতে হবে ওদের? হ্যাঁ, নিজের পায়েই সে দাঁড়াবে; না দাঁড়িয়ে তার উপায় কি। কিন্তু সে শুধু ওদের কাছ থেকে স্বাধীন হয়ে থাকার জন্যে। একটু বিরতির জন্যে কাঙাল হয়ে ওঠে লতা। শুধু একটু নিঃসাড় হয়ে চোখ বুজে থাকা। একটু শুধু প্রশান্তের কথা ভেবে বিষণ্ণ বিধুর হয়ে ওঠা। যে প্রশান্তকে সে বিয়ে করেছিল সেই এক অন্ধকার আত্ম-গোপনের দিনে। তারপর কয়েক মাসও একসঙ্গে কাটাতে পারেনি ওরা। জেলে থাকতেই সংবাদ পেয়েছিল: গুলিতে যারা মারা গেছে তাদের মধ্যে প্রশান্ত একজন। কয়েকটা মাসও তারা একসঙ্গে থাকতে পারল না? কেন পারল না! কেন পারলো না? কেন, কেন। একটা চিনচিনে জ্বালার মতো লতার মনে হয় সে শুধু ওদের জন্যে. ওই কল্যাণদের মতো লোকেদের জন্যেই —যারা কেবল একটার পর আর একটা লক্ষ্যের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলেছে, ওইখানে। যারা একটু থামতে চেয়েছে তাদের থামতে দেয়নি।

এবার জোর করেই সে থামবে। অনেক তো হল, এবার যদি দু-দণ্ড গা ছেড়ে দেয় সে তাতে কার কি ক্ষতি, কেন এসে যাবে ওদের?

কিন্তু পরের বার যখন কল্যাণ আসে তখন চমকে ওঠে লতা—একি চেহারা হয়েছে লোকটার। ওর স্বাভাবিক হাসিটুকু আর নেই। রগের পাশের পাকা চুলগুলো সহসা ভয়ানক রকম ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। হাঁ করা মুখটা বুড়ো জানোয়ারের মতো কুৎসিত। হঠাৎ মনে হয় শুধু প্রশান্তই মরেনি, কল্যাণরাও মরেছে, নয় তো মরবে। গুলি খেয়ে রক্তের মধ্যে নাও যদি হয় তবুও বোধহয় অমনিভাবে সাধ্যের

অতিরিক্ত বোঝা কাঁধে নিয়ে, হোঁচট খেতে খেতে, এগুতে এগুতে, হাঁপাতে হাঁপাতে। এ দুই মৃত্যুর মধ্যে কোনটা বেশি যন্ত্রণার, অথবা কোনটা বেশি গৌরবের? লতা একটু অন্যমনস্ক হয়ে যায় কিছুক্ষণের জন্য। আস্তে করে বলে, 'বসুন। একটু চা খাবেন।'

একমুহূর্ত আগে কল্যাণকে দেখে মনে হয়েছিল, ক্লান্তির যে চরম বিন্দুর সঙ্গে মৃত্যুর তফাৎ নেই কল্যাণ বুঝি সেইখানে নেমে গেছে। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই ফাটা ফাটা ঠোঁটে টেনে টেনে হাসে কল্যাণ. সেই মুখস্ত করা হাসি কিনা কে জানে।

'চা খাওয়াবেন? বাঁচালেন আপনি।' তারপর চুপ করে চোখ বুজে পড়ে রইল।

আর তৎক্ষণাৎ সেই জ্বালাটা আবার ফিরে আসে লতার একটু ধারালো করে। সে না বলে পারে না, 'আপনি বেশ সুখী। মনে হয় বেশ আছেন। কখনো আপনার একটু মন খারাপ করে না, না? একটু দুঃখ হয় না? একটু মন কেমন করে না, না?'

কল্যাণ কি ভাবে কে জানে। লতার নিষ্প্রভ বয়স্ক মুখখানার দিকে তাকিয়ে পরিহাসের চেষ্টা করে, বেশ বোঝা যায় ইচ্ছে করে; 'মুশকিল কি জানেন যদি লোকে টের পেয়ে যায় আমিও মন খারাপ করছি, তাহলে তাদের যখন বলতে যাবো মন ঠিক করে নাও এই কাজটা করতে হবে, তারা শুনবে কেন? শুধু শুধু মাঝে থেকে আমার চান্স মাটি, কেননা হাফ নেতা তো প্রায় হয়েই উঠেছি…'

লতা কিছু না বলে চা-টা এগিয়ে দেয়, 'এটা আমার চাকরি পাওয়ার চা। একটা মাস্টারি পেয়েছি। দু-তিন দিনের মধ্যে অন্য বাসায় চলে যাবো। আপনারা আমার দায় থেকে বাঁচলেন!'

কল্যাণ উৎসুক হয়ে উঠল, 'সত্যি বলছেন?'

'হাঁ! সত্যি চাকরি নিয়েছি একটা।'

'তা হলে ভালোই হল। আপনাকে ব্যাপারটা বলি'—কল্যাণ প্রস্তাব করে অনায়াসে, 'সেই ছেলেটার কথা বলেছিলাম না? শিয়ালদহ স্টেশনে পড়ে ছিল। তার একটা গতি করা যাবে হাসপাতালে।

তবে তার জন্য মোটামুটি শ-তিনেক টাকা লাগবে এখুনি। আপনার জন্যে কিছু করতে পারিনি বলে লজ্জায় ছিলাম। কিন্তু আপনি এখন যখন চাকরিটা পেলেন, তখন আপনিও কিছু দিন না আজ সারা দিন ঘুরেছি—বিশেষ কিছুই যোগাড় হয়নি।'

লতা হঠাৎ কথা বলতে পারে না। কি মানুষ কল্যাণ! কেনই বা এসব নিজের ঘাড়ে টেনে নেওয়া, কেনই বা অন্যকে জোর করে এর মধ্যে জড়াবার চেষ্টা। আর জড়াবেই যদি তো টাকা চাইবার সেই পরিচিত অভ্যস্ত কৌশল ছাড়া কি কল্যাণের আর কিছুই মনে হল না?

লতা দূরে সরে দাঁড়ায় একটু। তারপর দূর থেকেই নিস্প্রাণ গলায় কঠিন স্বরে বলে, 'না। আমি কিছু পারব না। এই প্রথম ঢুকলাম চাকরিতে। কটাই বা টাকা দেবে. আলাদা একটা ঘর ভাড়া নিয়েছি। অনেক খরচ আছে আমার।'

কল্যাণ একটু বিস্মিতের মতো তাকায়, কিছু বলে না। তাতে আরো যেন গা জ্বালা করে লতার। আরো কঠিন হয়ে ওঠে তার গলার স্বর, 'আর, তা ছাড়া আরো একটা কথা। রাজনীতি আমি আর করব না। আপনাকে এতদিন বলি বলি করেও বলিনি। আমার যা দেবার তাতো আপনাদের কথা শুনে দিয়েছি। প্রায় গোটা একটা যৌবন. স্বামী, সামর্থ্য। ভবিষ্যৎ তো নেই-ই! তাই একটু বিশ্রাম চাই এখন। আপনাদের বিশ্রামের প্রয়োজন নেই. আমার আছে।'

'কিন্তু ভবিষ্যতের জন্যেই তো আপনার উল্টো কথা বলা উচিত! ক্লান্ত ফাটাফাটা ঠোঁটে জোর করে হাসবার চেষ্টা করে কল্যাণ। বেশি টান দিলে ছিঁড়ে যাবে ভেবেই যেন সে তার গুরু কথাটাকে গ্রহণীয় করার জন্যই শুধু একটু লঘু পরিহাসের সুর ফোটাতে চেয়েছিল। কিন্তু লতা শান্তভাবে বলে, 'থাক। অনেক শুনেছি।'

তবু লতাই শেষ পর্যন্ত যায় কল্যাণের কাছে। ওই সেই ওদের ডেরায়। একটা খবরের কাগজের চারপাশে ছেঁড়া গেঞ্জি আর ময়লা লুঙ্গি পরা নানা ধরণের কয়েকটা লোক ঝুঁকে পড়েছে। কলতলায়

কে অত্যন্ত সযত্নে একটা অতি সস্তা দামের শার্টে সাবান দিয়ে চলেছে। যার বাজারের ডিউটি ছিল সে সদম্ভে তার কৃত্বিত্ব ঘোষণা করছে—এত অল্প খরচে এত চমৎকার আইডিয়া না|ক আর কারো মাথায় খেলতে পারত না। আবহাওয়াটা সেই একই লঘু পরিহাসের। লতা জানে কেন এ লঘুতার সুর। যে অস্তিত্ব অসহ্য সেটাকে সইতে হলে এ সুর দিয়ে ফাঁক না ভরলে উপায় নেই। লতা তা দেখেছে তার আত্মগোপন-জীবনে, জেলে সর্বত্র। তবু অসহ্য লাগে তার। তবু মনে হয় এ সব কিছুই যেন মুখস্ত, আত্ম-প্রতারণা।

বিশু ছুটে এল, 'লতাদি! আপনার সঙ্গে আর দেখাই করে উঠতে পারিনি—'

'তুই এখনো এখানে আছিস? কিছু জোটাতে পারলি না? চুক্তি ছিল তো মাত্র পনের দিনের?'

বিশু একটু আহত হয়। সত্যিই বিশেষ পয়সা না দিয়েই সে আছে। শুধু সে কেন আরো কয়েকজনও তো সব সময় হিসেব মতো পয়সা দিতে পারে না। পারত, কিন্তু কাগজ গুদামটাতে কাজ তো রইল না। তখন বেশি কাজ জমেছিল বলে নিয়েছিল।

'তাহলে চলে কেমন করে?'

'কল্যাণদা জানে। যে পারে তার কাছ থেকে জোর করে বেশি আদায় করে নাকি কে জানে। চালিয়ে তো নিচ্ছে।'

'সে কোথায়?'

'পূর্ববঙ্গ থেকে আরো দুজন কমরেড নাকি এসেছে। তাদের জন্যে কি একটা কাজে গেছে। একটু বসবেন?'

যারা হৈ চৈ করছিল, এর ওর সঙ্গে রহস্য করছিল আর মাঝে মাঝে গুরুতর রাজনৈতিক উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠছিল খবরের কাগজের কোনো কোনো সংবাদ দেখে, তারা লতাকে দেখে একটু চুপ করে। একটু ভদ্রতা করার চেষ্টা করে।

লতা ক্লান্তভাবে একটু হাসে, 'যাক ব্যস্ত হবেন না। আমি না হয় একটু বসি....'

কিন্তু কতোক্ষণ বসে থাকা যায়। কতোক্ষণ বসে বসে দেখা যায় এই চুনবালি খসা ঝুল-ভরা আস্তানাটাকে। তবু নিঝুম হয়ে তাই দেখে লতা। ইলেকট্রিকের তারগুলো ঝুলে ঝুলে পড়েছে, বাঁকা হয়ে মুখ বাড়িয়ে থাকা বাল্‌বের চেহারাটা দিনের আলোয় দেখে মনে হয় কোন ছানি পড়া ঢেলা-ফুটে-ওঠা বুড়োর চোখের মতো। ছাতের টালি আর দেয়াল ছাপিয়ে উঠেছে স্যাঁতাপড়া দাগ—যেন অন্তরালে বসে বসে কে তার বিদঘুটে বিশ্রী চোখের জলটুকু আর লুকিয়ে রাখতে পারছে না। আর, আশ্চর্য, ছেঁড়া-খোঁড়া, গিঁটবাঁধা, বারম্বার কাঁচা হাতে মেরামত করা, পেরেক খসে খসে আসা ইলেক্‌ট্রিক তারের একটা কালো ধূসর জটের মাঝখানে কোথা থেকে এসে জুটেছে দুটো চড়ুই। অনবরত খস খস করে পাখা ঝাপটিয়ে পাখি দুটো কয়েকটা কুটো গুঁজে গুঁজে বাসা তৈরি করে চলেছে অলক্ষ্যে, এই ঘিঞ্জির মধ্যেই, এই ভিড়ের মধ্যেই, এই কলকাতাতেই।

কল্যাণের জন্যে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করেনি আর লতা। যাবার সময় বিশুকে ডেকে বেশ কয়েকটা নোট দিয়ে গিয়েছিল ওর হাতে, 'কল্যাণবাবুকে দিস। আমার প্রথম মাসের মাইনে থেকে চাঁদা। সেই তিনশ টাকা উঠেছে কিনা জানিস? জানিস না? আচ্ছা চলি।'

কিন্তু রাস্তায় নেমেই মনটা তেতো তেতো লাগে লতার। সত্যি সত্যি অতগুলো টাকা সে কেন দিয়ে এল মরতে। সে তো বলেই দিয়েছিল, আর নয়। দেবে ভেবেও সে আসেনি। তার নিজের প্রয়োজন সামান্য হলেও সেটুকু ওতে সে মেটাতে পারেনি। আর শেষ পর্যন্ত কী ভবিষ্যৎ কল্যাণের এইসব বিষয়ে ঘাড় এগিয়ে দেওয়ার, সব ঝামেলা নিজের কাঁধে টেনে আরো পাঁচটা অনিচ্ছুক লোককে জোর করে তার সঙ্গে জড়িয়ে ফেলার।

ভেবেছিল কল্যাণের কাছে আর যাবে না। কিন্তু কল্যাণই এসে হাজির, আর কোনোদিন নয়, বেছে বেছে ঠিক তার মাইনে পাবার দিন দুয়েকের মধ্যেই। আর কোনো ভনিতা নয়, এসে অনায়াসে, যেন এই হওয়া উচিত, এমনি সুরে হাত পাতে, 'আপনার ও

টাকাগুলো যা কাজে দিয়েছে। খুব বাঁচিয়েছেন। তাই এ মাসেও এলাম....'

'কিন্তু আমি তো আপনাকে বলে দিয়েছি—'

'তা দিয়েছেন। তবু ব্যাপারটা আপনাকে বলি, আরো কিছু ঝামেলা এসে পড়েছে। কিছু পূর্ববঙ্গ কিছু এদিক ওদিক। বিশুটাও এখনো নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারল না। কিছুদিন বিনা লাইসেন্সে মাছ নিয়ে বসছিল রাস্তার ওপর। ভোরে শিয়ালদহ থেকে ধরত, রাস্তায় বসে বিক্রি করত। তাও হঠাৎ সেদিন হল্লার কবলে পড়ে মুচিপাড়া থানা থেকে ঘুরে এসেছে। দাড়িপাল্লা বাটখারাটুকু ফিরেছে, মাছ আর মূলধনটুকু ফেরেনি। থাক এসব তো আছেই। কিন্তু সেই টি-বি ছেলেটা। কোনোরকম করে ওকে হাসপাতালে ঢোকানো গিয়েছিল। কিন্তু কল্যাণ হাসল কেমন অদ্ভুতভাবে 'হতভাগা মরতে চলেছে, তবু রাজনীতি না বিবেক না কিসের একটা ভূত কিছুতেই ওকে ছাড়ছে না। হাসপাতালের কি সব অবস্থা দেখে রোগীদের সব জুটিয়ে হাঙ্গামা বাধিয়ে ছিল। অথরিটি প্রথমটায় বেকায়দায় পড়লেও পরে সামলে নিয়েছে। ওই শেষ পর্যন্ত একলা পড়ে গেল। ফলে এখন বহিষ্কার। অন্য হাসপাতালের কর্তৃপক্ষও ভীষণ অ্যাডামেন্ট—রোগী রোগী, করুণা করে ওকে গ্রহণ করা হয়েছিল। কিন্তু এ রকম বদখেয়ালী রোগীকে সহ্য করতে কেউ প্রস্তুত নয়।

তাই আমাদের ডেরাতেই তুলেছি। বললাম, 'ওরে ইডিয়ট সব মাটি করলি তো। এবার যে মরবি। বোকাটা অন্যদিকে তাকিয়ে ঠোঁট কামড়াচ্ছিল ; কি জানি কার ওপর অভিমানে কে জানে। বললে, কল্যাণদা, মরব তো জানি। কিন্তু যেন কাঁদতে কাঁদতে না মরি। আপনি আমাকে ছেড়ে যাবেন না ; ওষুধ চাই না, চিকিৎসা চাই না। তবু মরার আগে যেন কেঁদে না ফেলি কল্যাণদা ?....তাই ভাবছি, আমার তো চৈত্র গেছে। ওর যে ফাল্গুনও এল না...'

কল্যাণ আবার হাসার চেষ্টা করল। হাসতে পারল।কনা লতা দেখেনি, দেখতে পারেনি। মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিল অন্যদিকে। অন্যদিকে চেয়েই

এবারেও বেশ কয়েকটা নোট এগিয়ে দিয়েছিল লতা। আর কল্যাণ যাবার সময় হঠাৎ কি ভেবে বলেছিল, 'আমার একটা কাজ করে দেবেন?'

'নিশ্চয়, বলুন—'কিন্তু বলতে গিয়ে হঠাৎ একরাশ সঙ্কোচ এসে অকারণে আচ্ছন্ন করে ফেলে লতাকে। দূর। কেন সে বলতে যাবে। আর সব ছেড়ে কেন ঐ কল্যাণকেই। সে নিজেও কি পারত না। দূর। 'কী বলুন—'

আর তাতে আরো লজ্জায় লাল হয়ে উঠতে থাকে লতা। প্রায় একটা গোটা যৌবন যে নিঃশেষ করে আসতে পারে, তার রক্তেও এত লজ্জা জমা থাকতে পারে নাকি কখনো! যেন জোর করে, যেন স্পর্ধার সঙ্গেই লতা বলে, 'বলছিলাম, প্রশান্তের যদি একটা ফোটো জোগাড় করে দিতে পারেন, একটু বড়ো করে বাঁধানো। আপনি হয়ত হাসছেন…'

'না, না হাসব কেন। নিশ্চয়ই' কল্যাণের গলার স্বরটা যেন গভীর শোনায়—লতার প্রতি সহানুভূতিতে, নাকি মৃত সহকর্মী প্রশান্তের কথা মনে পড়ে কে জানে।

'কিন্তু আপনি, আপনি আর টাকা চাইবেন না আমার কাছে। চাইলে না দিয়ে পারি না তাই বলে চাইবেন? আমি তো বলেছি, অনেক তো হয়েছে আর ও-সবের মধ্যে নেই…' কেমন স্বপ্নাতুর আর করুণ হয়ে ওঠে লতার বয়স্ক নিষ্প্রভ গলার আওয়াজটুকু।

তারপর সত্যি কল্যাণ আসেনি। পরের মাসের বেতন পাওয়ার পরেও একদিন দু-দিন করে সাত-আট দিন কেটে গেল। কল্যাণ এল না। এল তার বদলে বিশু।

'কি আবার টাকা চাইতে তোকেই পাঠাল বুঝি?'

বোঝা গেল, বিশু বোকার মতো হাঁ-হু করে জবাব এড়িয়ে যেতে চাইছে। লতার ধমক খেয়ে শেষ পর্যন্ত সে যা বললে তা এই: ও জায়গাটা বিশু ছেড়ে দিচ্ছে। কেননা ঘরের মধ্যে একটা টি-বি রোগী। তার ওষুধ-পত্তরের জন্যে টানাটানি। বাকি লোকদের খাওয়া কেটে কল্যাণ টেনে-টুনে চালাচ্ছে। কিন্তু তার ওপর আবার হুকুম হয়েছে

বাধ্যতামূলক ভাবে সেবা করার। কেউ করতে চাইছে না। কয়েকজন খসে গেছে ইতিমধ্যে। বিশুও চলে আসবে ভাবছে। তাই লতাদির এখানে যদি জায়গা হয়। রোজগার সে কিছুদিনের মধ্যে নিশ্চয়ই করতে পারবে। লতাদি যদি তাকে রাখে।

'তাহলে ছেলেটাকে দেখছে কে?'

'এখনো কল্যাণদাই দেখছে। কিন্তু ওকি আর দেখা। কেন যে শুধু শুধু যতো ঝামেলা উনি নিজের ঘাড়ে সাধ করে টেনে নেন।'

লতা চুপ করে বসে বসে শোনে। তারপর শান্তভাবে বিশুকে ফিরিয়ে দেয়, না, এখানে তার জায়গা হবে না।

আর সন্ধ্যে বেলায়, লেবর ইউনিয়নের কাজ সেরে তার ছন্নছাড়া আস্তানাটায় ঢুকে চমকে ওঠে কল্যাণ, 'একি আপনি?'

'শুনলাম, সেবার লোক নেই আপনাদের, ছেলেটাকে মেরে ফেলবেন ঠিক করেছেন তো। তাই এলাম। কিন্তু দোহাই, হাসবেন না, আর মুখস্ত করা কোনো সারগর্ভ রাজনৈতিক উক্তি করবেন না।'

কল্যাণ হাসে না। লতার কথাটা ভালো করে শোনেও না বোধহয়। চিন্তিত ভাবে পায়চারি করে শুধু। যেন এ আঘাতে তার কিছুই এসে যায় না। পায়চারি করতে করতে থামে, 'একি, এ-সব জিনিস-পত্র?'

'আমার। এখানেই থাকব। শুনলাম, আপনাদের আস্তানা থেকে নাকি বিপদ দেখে কেউ কেউ খসেছে। সেই ফাঁকটুকুতে আমার জায়গা হবে না? তা ছাড়া টাকারও তো দরকার। ওখানে একটা এস্টাব্লিশমেণ্ট রাখলে আমার মাইনে থেকে কতোটুকুই বা আর বাঁচবে।'

মাসের বেতন সবটাই লতা তুলে দিয়েছিল কল্যাণের হাতে। তার পরের মাসেরটাও। তার পরের মাসেরটাও। যেন এইটেই স্বাভাবিক।

কল্যাণ উচ্ছ্বসিত হয়নি। ধন্যবাদও দেয়নি। শুধু বলেছিল, 'বাঁচালেন। ওদিকে লেবার ইউনিয়নটায় ষ্ট্রাইক ব্যালট চলছে। সেখানে অনেকখানি সময় দিতে হচ্ছিল আমার। ওদের কাছ থেকে মাঝে মঝে যেটুকু তুলে আনতে পারতাম, তাও আর আনা যাবে না।

ওদের নিজেদেরই কাণ্ডের দরকার। 'আপনি আসাতে এ-দিকটা একটু নিশ্চিন্ত।'

আর নিঃসঙ্গ রোগশয্যার ওপর উত্তেজনায় উঠে বসে ছেলেটা লতার হাত চেপে ধরে কেঁদে ফেলেছিল আবেগে: 'লতাদি, মরব জানি। ভেবেছিলাম মরার আগে যেন কাঁদতে না হয়। কাঁদতে চাইনি আমি। কিন্তু কেন এলেন আপনি? বাঁচাতে পারবেন না জানি, কেন এলেন শুধু শুধু?' ছেলেটার পাণ্ডুর গালদুটোর ওপর এক ঝলক রক্তের উচ্ছ্বাস কেমন একটা অদ্ভুত মায়া জাগিয়ে রেখেছিল। কেন জানি সে-দিকে স্থির তাকিয়ে থাকতে পারেনি লতা।

কল্যাণ ভেবেছিল, এবার বুঝি একটু নিশ্চিন্তি। কিন্তু একমাস দু-মাস তিনমাস—হন্যে হয়ে গেল সে ছেলেটাকে আবার একটা হাসপাতালে পাঠাবার চেষ্টায়। যারা খসেছিল লতা আসায় তারা লজ্জা পেয়ে আবার ফিরে এসেছিল কেউ কেউ। কিছুদিন হিসাব মিলল ঠিক ঠিক। সময় মত ষ্ট্রেপটোমাইসিন না জোটাতে পারায় লজ্জায় পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে হল না কল্যাণকে। ঘড়ি ধরা টাইমে খাবার না পাবার অভিমানে পাশ ফিরে শুয়ে থাকতে হল না রোগীকে। কিন্তু সে শুধু প্রথম কয়েকদিন। তারপর আবার ভেঙে ভেঙে পড়তে লাগল ব্যবস্থা। আবার এক এক করে খসতে লাগল দু-একজন।

অথচ এখনো পর্যন্ত ক্রমাগত নতুন নতুন ঝামেলা মাথা পেতে নেবার বিরাম নেই কল্যাণের। তিনজন কমরেড এসেছে পূর্ববঙ্গ থেকে গোপনে পালিয়ে। আবার ফিরে যাবে, ইতিমধ্যে কয়েকদিন একটু খাওয়াতে হবে এখানেই। কারখানায় এ্যাক্সিডেণ্টে মারা গেছে কালি মিস্ত্রি। তার বৌ-ছেলেকে রাখতে হবে কয়েক দিন—কোম্পানির সঙ্গে ক্ষতিপূরণের মামলাটা ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত। কয়েকটা বই যোগাড় করতে হবে—পূর্ববঙ্গের জেলখানায় কমরেডরা কিছুই নাকি পড়তে পাচ্ছে না।

অত্যন্ত বাঁধা টাইমে পথ্য না পেয়েও ছেলেটা আর কাঁচা অভিমানে পাশে ফিরে শুয়ে থাকে না। লতার হাত চেপে ছেলেমানুষী ভাবাবেগে

কেঁদেও ফেলে না। ক্যাসকেসে চোখে—চুপ করে চেয়ে চেয়ে দেখে সেই ঝুলি ঝুলি ইলেকট্রিক তারের ঝোপটা। চড়ুইগুলো বাসা বাঁধতে পারেনি। তবু রোজই একবার করে কুটো মুখে করে এসে বোকার মতো বসে। হঠাৎ ক্ষেপে ওঠে লতা। এ কীসের মধ্যে জড়িয়ে পড়ছে সে। যেখান থেকে পালাবে ভেবেছিল, যেন এক কুটিল চক্রান্ত করে তার মধ্যেই টেনে নামিয়েছে তাকে কল্যাণ। লতা জানে এই ওদের অভ্যেস—এই ওদের কৌশল। এমনি করেই প্রশান্তকে ওরা এগিয়ে দিয়েছে গুলির মুখে। এমনি করে কল্যাণ একদিন তার ভাঙা-চোরা সংগঠনের সব ভার কাঁধে টানতে টানতে হুমড়ি খেয়ে মরবে। মরুক। তাতে মরতে কেন এসে জড়াল লতা। কেন? ক্ষিপ্তের মতো এসে সে কল্যাণকে ঝাঁকুনি দেয়, 'আমি আর থাকব না এখানে, বুঝেছেন? আর থাকব না!'

কল্যাণ মাথা তোলে আর অসহ্য লাগে তার পেকে ওঠা দাড়ির কুৎসিত খোঁচাগুলো।

'কেন?'

'কেন থাকব! কি দায় পড়েছে আমার। আমি তো আগেই বলেছিলাম। না—না—না। কেন আপনি আমায় এ-সবের মধ্যে জড়ালেন? আমি নেই এর মধ্যে, না আর একদিনও না—। তাছাড়া....'

'তাছাড়া কি?'

'তাছাড়া নিন্দে রটছে তাও বোঝেন না? ইস্কুলের সেক্রেটারি কোথা থেকে খবর পেয়েছে। রাজনীতির কথা নিয়ে এতদিনও কিছু করতে পারিনি। এখন নিন্দের সুযোগ পেয়ে উঠে পড়ে লেগেছে।' লতা বেরিয়ে চলে যায় তার সুটকেস আর ছোটো বিছানাটা কুলির মাথায় চাপিয়ে।

কল্যাণ চুপ করে চেয়ে চেয়ে দেখে, বাধা দিতে পারে না। দিতে চায়ও না। একটু হাসতে চেষ্টা করল কল্যাণ। আর হঠাৎ আতঙ্কে টের পায় সে হাসতে পারছে না। অনেকদিন সে হাসেনি। হাসতে ভুলে গেছে। যে লঘু পরিহাসের হাসিতে জীবনে বড়ো বড়ো দুর্ভাবনাকে

সে এতদিন সহনীয় করে নিতে পেরেছে সেটা হঠাৎ যেন কী একটা অভিশাপ দিতে দিতে শুকিয়ে গেছে তার বয়স্ক ফাটাফাটা ঠোঁটের ওপর।

দু'দিন স্তব্ধের মতো কোথায় কোথায় ঘুরল কল্যাণ। তৃতীয় দিনে ফিরে এল ছেলেটার শিয়রে ; 'কেমন আছিস ?'

'আপনি আমায় শিয়ালদহ স্টেশনে পৌঁছিয়ে দিয়ে আসুন কল্যাণদা। ভেবেছিলাম মরতে হলেও যেন না কেঁদে মরতে পারি। কিন্তু এ-বাড়িতে থাকলে পারব না তা....'

কল্যাণ চুপ করে থেকে বলে, 'না এখানে থাকব না। এত বড়ো এসটাব্লিশমেণ্ট টানব কি করে। একটা ঘর দেখে এসেছি একটু দূরে। খোলার বাড়ি। কষ্ট হবে ? সেখানেই উঠে যাব আজ।'

একটা ঠেলার ওপর টুকিটাকি জিনিসপত্র আর রাজ্যের রাজনৈতিক বই চাপিয়ে বড়ো রাস্তায় এসে দাঁড়ায় ওরা। ছেলেটা কিছুতেই রিক্সায় উঠতে চাইল না, 'না, হাঁটব, হেঁটেই যেতে পারব কল্যাণদা, আমায় হাঁটতে দিন'...

দুই চোখ দিয়ে সে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল কলকাতাকে। চৈত্রদিনের কলকাতা। পাঁশুটে পীচ আর ধুলো ধুলো ট্রাম আর জানোয়ারের মতো হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে চলা বাসগুলোর গা থেকে ঝিমঝিমে নেশার মতো একটা যান্ত্রিক তাপ উঠছে সবকিছু আচ্ছন্ন করে। একটা চাবুক খাওয়া ক্রোধ যেন তারে তারে আর্তনাদ করে ঝাঁপিয়ে মরছে শূন্যে।

'কল্যাণ ! একটু দাঁড়ান—'

চমকে ওঠে কল্যাণ, 'লতা, আপনি ?'

লতা তার হাতের সুটকেশ আর হাস্যকর ছোট বেডিংটা ঠেলার ওপর চাপাতে চাপাতেই হঠাৎ ঝটকা মেরে ঘুরে দাঁড়িয়ে নির্লজ্জের মতো একেবারে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলে ওই রাস্তার ওপরেই ! না সে পারবে না, সে পারল না। এই সেধে সেধে দায় ঘাড়ে নেওয়া, বই থেকে মুখস্ত করা সত্যির নেশায় হোঁচট খেতে খেতে এগিয়ে যাওয়া মানুষ-

গুলোকে ছেড়ে কি করে সে থাকবে, কি করে সে পারবে! কল্যাণ অপ্রস্তুতের মতো তাকে যতই সান্ত্বনা দিতে যায়, ততই ছেলেমানুষের মতো স্বপ্নের আবেগে মাথা ঝাঁকাতে থাকে এই নিষ্প্রভ, বয়স্কা মেয়েটা। না, না, সে পারবে না। প্রশান্তকে ছেড়ে সে থাকতে পারেনি। কল্যাণকে ছেড়েও সে পারবে না। প্রথম দিন থেকেই সে জানত, সে পারবে না। যতোই চেষ্টা করুক সে পারে না—পারেনি।

গভীর গলায় কল্যাণ শুধু একবার ডাকল, 'লতা! ছি কাঁদে না!' তারপর লটবহর, ঠেলা, রোগী নিয়ে হাঁটতে থাকে সামনের দিকে। লতা গা ঘেঁষে আসে তার। আর অনেক পেছনে দেখা যায় অপ্রতিভের মতো বিশুও আসছে হোঁচট খেতে খেতে।